লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

Fortnightly
The Ahmadi
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ১৬তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ফাল্গুন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ১১ জমা. সানি, ১৪৩৯ হিজরি | ২৮ তবলীগ, ১৩৯৭ হি. শা. | ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ঈসাব্দ

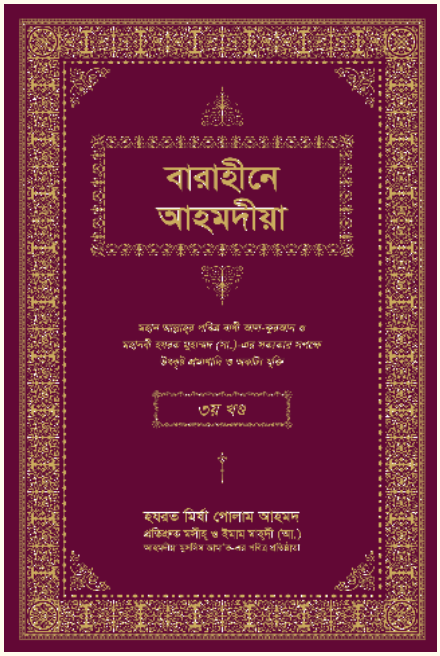

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত, 'বারাহীনে আহমদীয়া' তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তকটি যেন হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। কেননা, তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তক এবং পাদটীকা-২-এর বিষয়বস্তু চলমান রাখা হয়েছে আর যা ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকটির চতুর্থ খণ্ডে গিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকটির মূল উর্দু সংস্করণে প্রতিপাদ্য মূলবিষয়, টীকা এবং পাদটীকা একই পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে অনুদিত এই গ্রন্থে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল পাঠ একটানা ভাবে শেষ করার পর যথাক্রমে টীকা-১১ এবং পাদটীকা ১ ও ২ অংশ সন্নিবেশিত রয়েছে।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত
'শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া'
পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

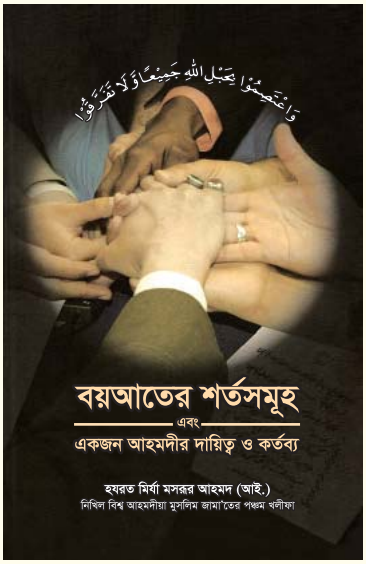

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি 'গাইড বুক' বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি? প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

সম্পাদকীয়

“বালায়ে দামেস্ক”-দামেস্কের দুরবস্থা
“ইয়াদউনা লাকা আবদালাশ্ শামে ওয়া ইবাদাল্লাহে মিনাল আরাবে”
অর্থাৎ তোমার জন্য সিরিয়ার সাধুগণ এবং আরবের বান্দাগণ দোয়া করছে

সিরিয়ার বিদ্রোহী বাহিনী পূর্ব ঘাওয়াতের দামাস্কাস উপকূলে আক্রমণ হানলে গত এক সপ্তাহে বহু শিশুসহ ৫২০ জন মানুষ মারা গেছে এবং হাজার হাজার লোক আহত হয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ানক যে, ইউনিসেফ মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃতিতে বলেছে, নিরীহ শিশুদের, মৃত্যুবরণকারী মায়েদের, পিতাদের এবং তাদের প্রিয়জনদের হত্যাকে বৈধতা দিতে পারে ন্যায়তঃ এমন কোন শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে কী!

বিশ্বে শরণার্থীদের সংখ্যা সংযোজনে সিরিয়ার অবস্থান শীর্ষে । এ সংখ্যা বর্তমানে ৪৯ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে, যার অর্ধেকই শিশু। সিরিয়ার সংঘাত ২৮ লক্ষ শিশুকে স্কুল ছাড়া করেছে, এর ২১ লক্ষ রয়েছে সিরিয়ায়, আর ৭ লক্ষ দেশহারা হয়েছে। প্রায় ৩০ লক্ষ শিশু শরণার্থী সহ ৮৬ লক্ষ সিরিয় শিশুর অবিলম্বে সাহায্যের প্রয়োজন। (তথ্যসূত্রঃ ইউনিসেফ ইউএসএ ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৮)

সিরিয়ার কেবল বর্তমান অবস্থাই নয় বরং পুরো আরব বিশ্বের অবস্থার প্রেক্ষিতে পৃথিবীতে অনেক বেশি ধ্বংসযজ্ঞের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সিরিয়া-যুদ্ধে পরাশক্তিগুলো জড়িয়ে পড়ায় শুধু আরব বিশ্বই নয় বরং সমগ্র বিশ্বই অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

ভয়াবহ এই পরিস্থিতির পূর্বেই বিগত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় বলেছিলেন,... আমি ২০১১ সালের শুরুতে একটি খুতবায় বলেছিলাম, পরাশক্তিগুলো প্রকাশ্যে ও গোপনে যে ষড়যন্ত্র করছে তা মুসলমানদের কল্যাণার্থে প্রতিফলিত হবে না। ...মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের উচিৎ তারা যেন সর্বদা সরকারের কাজে নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করে এবং ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে কেবলমাত্র মুসলমান জাতির কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়। শাসক এবং জনসাধারণের হৃদয়ে যখন তাক্ওয়া সৃষ্টি হবে এবং উভয়েই মহানবী (সা.)-কে ভালোবেসে তাঁর সর্বোত্তম আদর্শের ওপর আমল করার চেষ্টা করবে কেবলমাত্র তখনই এটি পূর্ণতা লাভ করবে।

সুতরাং শাসকদেরকে গভীরভাবে এগুলো চিন্তা করা প্রয়োজন। জেনে রাখা দরকার, কোন মুসলমান শাসক যদি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় পেতে চায় তবে তাকে অবশ্যই সুবিচার করতে হবে। খোদার প্রিয় বান্দা হতে চাইলে অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। সকল কাজে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা যদি জান্নাত পেতে চায় তবে কোন প্রকারের বৈষম্য না করে সকলের মঙ্গল কামনা করতে হবে।

সুতরাং ইসলামের মধ্যে অধিকার আদায়ের নামে তথাকথিত হরতাল, রক্তপাত এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোন অনুমতি নেই। আল্লাহ্ তা'লার নিকট অধিকার প্রার্থনা করলে তিনি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যেখানে পৃথিবীর কোন শক্তি পৌঁছুতে পারবে না। এক বর্ণনায় রয়েছে, “একজন সাহাবী রাসূলে পাক (সা.)-কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমাদের প্রতি যদি এমন শাসক নিযুক্ত হয় যারা আমাদের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার চায় ঠিকই অথচ আমাদেরকে অধিকার প্রদান করে না, এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কী? [হুযূর (আই.) বলেন, আরবের আহমদীরা আমাকেও একই প্রশ্ন করেছে] তখন রাসূল করীম (সা.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবী পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন, তিনি (সা.) এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বার একই প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় হযরত আশাআত বিন কায়েস (রা.) তাকে চুপ করানোর জন্য পিছন থেকে টানলেন আর বুঝাতে চাইলেন যে, হুযূর (সা.)-এর এই প্রশ্নগুলো ভালো লাগেনি, তুমি পিছনে আস, এ প্রশ্ন করো না। তখন রাসূল করীম (সা.) বললেন, এমতাবস্থায় নিজেদের শাসকদের কথা মান্য কর এবং তাদের আনুগত্য কর। তাদের জবাবদিহিতা তাদের কাছ থেকে নেয়া হবে এবং তোমাদের জবাবদিহিতা তোমাদের কাছ থেকে নেয়া হবে।”

সুতরাং সব কথার সারমর্ম হলো “একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না।” শাসক প্রজাদের ওপর অত্যাচার করবে না এবং প্রজারাও নিজেদের অধিকার আদায় কল্পে এমন কিছু করবে না যাতে করে অত্যাচার সাব্যস্ত হয়। এখন এটি শাসক এবং প্রজা উভয়েরই দায়িত্ব যে, তারা যাচাই করুক এই মানদন্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা। শাসকগণ নিজেকে জিজ্ঞেস করুন তারা ন্যায়ের সুউচ্চ মাপকাঠি থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন না তো? প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে তাঁর শিক্ষানুযায়ী চলছেন তো? একইভাবে প্রজারা শরীয়ত বিরোধী আদেশ-নিষেধ ব্যতীত শাসকের অন্য সব আদেশ **সামে'আনা ওয়া আতা'না** (অর্থাৎ শুনলাম এবং মানলাম– অনুবাদক) বলে মান্য করছেন তো? অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কেবল মাত্র আল্লাহ্ তা'লার সমীপেই কান্নাকাটি করছেন তো? বর্তমানে যদি এমনটি কেউ করে থাকে তবে সম্ভবত তা কেবল আহমদীরাই হবে। আর যদি কেউ না থাকে তবে আমরা **“যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি”**-এর যুগে চলে যাব। অবশ্য মুসলমানদের ওপর এমনটি হওয়াই ভবিতব্য ছিল। কুরআন করীম এবং হযরত রাসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্দীয়ে মাওউদের জামানায় এটি হবার কথা ছিল।

সম্পাদকীয়'র বাকী অংশ ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সূচিপত্রে

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' (৪র্থ খণ্ড) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১০
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ২০
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)
প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

সংবাদ ২১

বিশ্বশান্তি : ২৬
সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

আমাদের খোদা ২৯
ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে জলসা সালানায় প্রদত্ত বক্তৃতা
মূল হাফেয ড. সালেহ মুহাম্মদ আলদীন

কলমের জিহাদ ৩৩
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ৩৭
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

আমের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় ৪০
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

হুযূর (আই.)-এর ৪৩
তাজা নির্দেশনা

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী ৪৪

প্রচ্ছদ পরিচিতি : প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিগুলো ট্যুইটার থেকে নেয়া

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

Visit করুন : www.theahmadi.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣٢﴾

৩২। আর দারিদ্রের[১৬১৩] ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরাই তাদের এবং তোমাদেরও রিযক দেই। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ[১৬১৪]।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٣﴾

৩৩। আর তোমরা ব্যভিচারের[১৬১৫] ধারে-কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা প্রকাশ্য অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত মন্দ পথ।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٤﴾

৩৪। আর যাকে (হত্যা করতে) আল্লাহ নিষেধ করেছেন তাকে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না। আর যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমরা তার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ নেয়ার) পূর্ণ অধিকার দিয়েছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত[১৬১৬]।

১৬১৩। যেসব কৃপণ পিতামাতা সন্তানের জন্য উপযুক্ত ভরণপোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না তারা প্রকারান্তরে সন্তানের দৈহিক এবং নৈতিক উভয় ক্ষেত্রে হত্যায় সহযোগিতা করে। এভাবে নির্দোষ শিশুদের হত্যা করে ফেলার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। সঠিক শিক্ষা এবং উপযুক্ত সুবিধার মাধ্যমে তাদের পূর্ণ মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করলে তারা সমাজের সত্যিকার উপযোগী কার্যকর সদস্যে পরিণত হবে। সন্তান হত্যার তাৎপর্য এও হতে পারে, অপ্রয়োজনে আপত্তিকর জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যে সম্বন্ধে বর্তমান সমাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

১৬১৪। 'খিতউন' এবং 'খাতাউন' এর অর্থে প্রভেদ রয়েছে। প্রথমোক্ত শব্দ ইচ্ছাকৃতবোধক এবং পরবর্তী শব্দ ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় অর্থবোধক (আকবার)। কুরআন শরীফ প্রথমোক্ত শব্দের ব্যবহার দ্বারা সন্তান হত্যা করার ব্যাপারকে পাপ বলে সাব্যস্ত করেছে যার বিরুদ্ধে মানব-প্রকৃতি বিদ্রোহ করে এবং একমাত্র মানবানুভূতি বিবর্জিত ব্যক্তিই এ কাজ করতে পারে।

১৬১৫। 'সন্তান হত্যার' নিষেধাজ্ঞার পরেই ব্যভিচার সম্পর্কে আরো একটি কঠোর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। কারণ ব্যভিচারের মাধ্যমেও অসংখ্য শিশুর হত্যা বিভিন্ন আকারে ঘটে থাকে। বাইবেলের আদেশ- 'তোমরা ব্যভিচার করবে না'। এর মোকাবেলায় কুরআন করীম বলে, 'ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যেয়ো না' যা অধিক কার্যকর এবং বোধগম্য। কুরআন ব্যভিচারের কর্মেই কেবল নিন্দা ও নিষিদ্ধ করে নি, রবং এর নিকটবর্তী হওয়ারও সব পথ রুদ্ধ করেছে।

১৬১৬। পূর্ববর্তী দু'টি আয়াতে পরোক্ষ হত্যার ইঙ্গিত করা হয়েছে। বর্তমান আয়াত প্রত্যক্ষ হত্যা সম্বন্ধে বর্ণনা করেছে। যথাযথভাবে গঠিত বিচারালয়ে অভিযুক্ত হত্যাকারী অপরাধী বলে প্রমাণিত হলে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের এই অধিকার রয়েছে যে, আইনবলে হত্যাকারীর প্রাণ বধ কার্যকর করতে পারে অথবা নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর বিনিময়ে তারা রক্তপণ গ্রহণ করতে পারে। যাহোক, ওয়ারিশকে রক্তের বদলে অর্থের খেসারত প্রদান যদি জনসাধারণের শান্তি অথবা নৈতিকতার পরিপন্থী হয় অথবা ওয়ারিশদের রক্তপণ সম্বন্ধে দাবি যদি প্রকৃত প্রমাণিত না হয় তাহলে আদালত তাদের ঐচ্ছিক অধিকার নাকচ করে দিয়ে হত্যাকারীর প্রাণ দন্ডাদেশ কার্যকর করার রায় দিতে পারেন। বাস্তবিকপক্ষে রাষ্ট্র এবং নিহতের ওয়ারিশগণ উভয়ই দোষীকে ক্ষমা করে দেয়া অথবা দন্ড দেয়ার ক্ষেত্রে সমান অধিকার রাখে। অপরাধী ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রের এখতিয়ার প্রতিকার সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রযোজ্য। কিন্তু আয়াতের প্রথমাংশে দোষী ব্যক্তির অধিকারও সংরক্ষণ করা হয়েছে, যেমন হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে বাক্যাংশে হত্যাকারীর পক্ষে সুপারিশের কথা নিহিত রয়েছে। এ কথায় ইশারা করা হয়েছে, যদিও সাধারণ নিয়ম খুনের বদলা খুন তবুও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক এ আদেশ শাব্দিক অর্থে প্রয়োগ করার জন্য সর্বাবস্থায় জিদ ধরা উচিত নয়। আইনের চরম শাস্তি হত্যাকারী তখনই পাবে যখন সমতা, সাধারণ শান্তি ও নৈতিকতার নিয়ম অনুরূপ অবস্থার দাবি করে। যদি ক্ষমার ফলে মনে করা যায়, অপরাধী নৈতিক সংশোধনের পথ গ্রহণ করবে তা হলে রক্তের বদলে অর্থগ্রহণ করে তার জীবন রক্ষা করা যেতে পারে।

হাদীস শরীফ
সকল ধর্মের উপাসনালয় সুরক্ষাপ্রাপ্ত নিরাপদ স্থান

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) মুসলিম দেশে বিধর্মীদের সম্বন্ধে বলেছেন, যদি কোন মুসলমান এদেরকে অহেতুক হত্যা করে, তাহলে সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এই হাদীস দ্বারা হযরত রসূল করীম (সা.) মুসলিম ও অমুসলিমের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ করেন নি। তিনি (সা.) আরেক জায়গায় বলেন, 'বিধর্মীদের ধন-সম্পদ আমাদেরই ধন-সম্পদের মত এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই মূল্যবান।'

কুরআনঃ

'আল্লাহ্ যদি এই সকল মানুষের একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে সাধু-সান্ন্যাসীগণের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ, যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, তা অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়া হত'। (সূরা হজ্জ : ৪০)

হাদীসঃ

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিধর্মী জিম্মিকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। এই ঘ্রাণ তো এত তীব্র যে, চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে তা উপলব্ধি করা যায়'। (বুখারী, কিতাবুল জিযিয়া)

ব্যাখ্যাঃ

হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) মুসলিম দেশে বিধর্মীদের সম্বন্ধে বলেছেন, যদি কোন মুসলমান এদেরকে হত্যা করে, তাহলে সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এই হাদীস দ্বারা হযরত রসূল করীম (সা.) মুসলিম ও অমুসলিমের জান ও মালের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন নি। তিনি (সা.) আরেক জায়গায় বলেন, 'বিধর্মীদের ধন-সম্পদ আমাদেরই ধন-সম্পদের মত এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই মূল্যবান।'

এখানেও আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, অমুসলিমদের সকল ধরণের স্বাধীনতা আছে। তাদের জান, মাল ও ধর্মীয়-উপাসনালয়ের সব কিছুই মুসলমানদের জান, মাল ও ইবাদতগৃহের মতই শ্রদ্ধার পাত্র।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবন দ্বারা এই কথা প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, ধর্মের নামে কোন অন্যায়-অবিচার নেই। সকল ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো শ্রদ্ধার পাত্র। আজ মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাগুলোকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়নের সময়। চতুর্থ হিজরীতে তিনি (সা.) খৃষ্টানদের ধর্মীয়-স্বাধীনতা দান করে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন–"কোন মুসলমান এই আদেশের অমান্য করলে সে খোদার আদেশ অমান্য করবে এবং নিজ ধর্মকে অপমান করবে"।

অন্য ধর্মের প্রতি মর্যাদাবোধ ও তাদের উপসনালয় ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের যে দৃষ্টান্ত হযরত রসূল করীম (সা.) দেখিয়েছেন, তা তাঁর সীরাতের উজ্জলতম অধ্যায়। তাই আমাদের দায়িত্ব, নিজ দেশে অবস্থানকারী সকল অমুসলিম ভাইদের জান মালকে যেন নিজেদের জান মাল মনে করে রক্ষা করি ও সীরাতে নববী (সা.)-এর শিক্ষাগুলোকে যেন নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়িত করে ধর্মের নামে রক্তপাতকে বন্ধ করি।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ: **আলহাজ্জ মাওলনা সালেহ্ আহমদ মুরুব্বী**
সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

শেষ যুগে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ধর্ম বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

সুতরাং তুমি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মত আচরণ পরিহার কর আর বিরোধিতা ও অন্যায়ের পথ এড়িয়ে চল, সত্যকে গ্রহণ করো, আর কৃপণদের মতো হয়ো না। নবী (সা.) যেখানে তাঁকে মসীহের গুণে গুণান্বিত আখ্যা দিয়েছেন বরং তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন, আর তাকে তাঁর নিজ মহান সত্তার গুণে গুণান্বিত আখ্যায়িত করেছেন এবং মুস্তফা সদৃশ 'আহমদ' নামে অভিহিত করেছেন।

আল্লাহ্ তাঁর আদি-জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতেন, শেষ যুগে খ্রীষ্টান জাতি সত্য-ধর্মের সঠিক পথের বিরোধিতা করবে এবং সম্মানিত প্রভুর পথে বাধা সৃষ্টি করবে ও প্রকাশ্যে মিথ্যাচার করবে। একই সাথে তিনি এটিও জানতেন, সে যুগে মুসলমানরা কুরআনের সুমহান শিক্ষাকে পরিত্যাগ করবে এবং এমন সব বিভ্রান্তিকর বিদা'তের অনুসরণ তারা করবে, যা কুরআন থেকে প্রমাণিত নয়। ধর্মের জন্য সহায়ক এবং মু'মিনদের ঈমানী-পোষাকের সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিষয়াবলীকে তারা পরিত্যাগ করবে।

তারা বিদা'ত, কুপ্রবৃত্তি ও দুষ্কৃতিপরায়ণতার ধ্বংসাত্মক-গহ্বরে পতিত হবে। নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ধর্ম বলতে তাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এ যুগে দু'শ্রেণীর সীমালঙ্ঘনকারীদের সংশোধন ও মিথ্যাবাদীদের মুখ বন্ধ করার জন্য তখন অনুগ্রহ ও করুণার নিদর্শনস্বরূপ তিনি এক ব্যক্তিকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনার দাবি ছিল, প্রেরিত ব্যক্তির নাম খ্রীষ্টানদের সংশোধনের নিরিখে 'ঈসা' আর মুসলমানদের তরবিয়তের নিরিখে 'আহমদ' রাখা, এবং তাঁকে উভয় দলের রীতি-নীতি ও পথ ঘাট ভালভাবে অবগত করা। অতএব তিনি তাঁকে উল্লেখিত দু'টো উপাধি দিয়েছেন এবং উভয় পানীয় থেকে পান করিয়েছেন এবং তাঁকে মু'মিনদের দুঃখ বিমোচনকারী ও খ্রীষ্টানদের নৈরাজ্য নির্মুলকারী নিযুক্ত করেছেন। অতএব খোদার দৃষ্টিতে একদিকে তিনি ঈসা এবং অপরদিকে আহমদ।

সুতরাং তুমি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মত আচরণ পরিহার কর আর বিরোধিতা ও অন্যায়ের পথ এড়িয়ে চল, সত্যকে গ্রহণ করো, আর কৃপণদের মতো হয়ো না। নবী (সা.) যেখানে তাঁকে মসীহের গুণে গুণান্বিত আখ্যা দিয়েছেন বরং তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন, আর তাকে তাঁর নিজ মহান সত্তার গুণে গুণান্বিত আখ্যায়িত করেছেন এবং মুস্তফা সদৃশ 'আহমদ' নামে অভিহিত করেছেন। তোমার জানা উচিত, তিনি যে এ দু'টো নাম পেয়েছেন, তা দু'টো সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টির কারণে।

সুতরাং খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়ের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি ও বন্দীর প্রতি সহমর্মীতার ন্যায় তাদের খাতিরে ব্যথিত হবার কারণে স্বর্গের অধিপতি তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন। অনুরূপভাবে নবী (সা.)-এর উম্মতের জন্য তাঁর গভীর হিতাকাঙ্ক্ষিতার কারণে তাঁকে আহমদ নাম দিয়েছেন। তাদের ভয়াবহ মতভেদ এবং ঘৃণ্য-জীবন দেখে তাঁর মর্মপীড়া আরও বেড়ে যায়। সুতরাং তোমার জেনে রাখা উচিত, প্রতিশ্রুত ঈসাই আহমদ আর প্রতিশ্রুত আহমদই ঈসা। এ সমুজ্জ্বল রহস্যকে অবজ্ঞা করো না। তুমি কি অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা আর খ্রীষ্টানদের হাতে যা ঘটেছে তা দেখছো না? তুমি কি দেখছো না, আমাদের জাতি ধর্মীয়-সংস্কার ও ধর্মীয়-শিক্ষাকে কলুষিত করেছে? শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে করতে তাদের অধিকাংশের জ্ঞান জোনাকীর আলোর ন্যায় ক্ষীণ এবং তাদের আলেমরা মরুভূমির মরীচিকাতুল্য হয়ে গেছে। দুস্কৃতির অনুসরণ তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং মানব স্বভাব বিরুদ্ধ সব অপকর্ম এক পর্যায়ে তাদের জন্য স্বভাবসিদ্ধ বাসনার রূপ নিয়েছে, আর তারা নাছোড়বান্দার ন্যায় জাগতিকতার প্রতি আসক্ত হয়েছে।

(সির্‌রুল খিলাফাহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণ পৃ. ৭১-৭২ থেকে উদ্ধৃত)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

৪র্থ খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(২য় কিস্তি)

(বারাহীনে আহমদীয়া ৩য় খণ্ড পুস্তকের মূল পাঠ্যাংশের শেষ থেকে ধারাবাহিকভাবে চলমান)

অর্থাৎ তাঁর সত্ত্বা , গুণাবলী ও কর্মে অন্যের অংশীদারিত্ব হতে পবিত্র হওয়া আর পূর্ণ ক্ষমতায় সমৃদ্ধ হওয়া এমন বিষয় নয় যা কেবল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে থাকবে বরং যৌক্তিক প্রমাণাদি ও সত্ত্বা, গুণাবলী ও কর্মে খোদার এক-অদ্বিতীয় হওয়া অনস্বীকার্য ও আবশ্যক সাব্যস্ত করে এবং নিশ্চিৎ ভাবে তিনি যে সত্য উপাস্য বা তাঁর খোদা হওয়ার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাঁর সে সকল বিশেষত্বের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করে। অতএব এসব নির্বোধদের এখন লজ্জাশীলতা ও লজ্জাবোধকে কিছুটা হলেও কাজে লাগিয়ে ভাবা উচিত; যারা ঐশী বাণী বা ঐশী গ্রন্থের অনন্যতা অস্বীকারে কেবল এই আপত্তি উত্থাপন করে বেড়ায় যে, যেখানে খোদার বাণীও আমাদের কথার শ্রেণীভূক্ত, আর সে সকল কথা ও শব্দেরই সমন্বয় যার ভিত্তিতে আমাদের কথা গঠিত, সেখানে কারণ কী যে, আমরা এর অনুরূপ কিছু বানাতে পারব না?

এমন লোকদের অবস্থা দেখে কান্না পায়, যাদের এমন সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট সত্যও বোঝা হয়নি, যা অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। যদি এদের ভিতর সামান্য পরিমান খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান থাকত তাহলে এই বাজে আপত্তি করতে গিয়ে প্রথমে এটিই ভাবতো যে সত্ত্বা, গুণাবলী ও সমুদয় কর্মে খোদার এক অদ্বিতীয় হওয়া আবশ্যক কিনা? এই প্রমাণ সম্পর্কে না ভাবলেও, হায়! অন্ততঃ পক্ষে এই দ্বিতীয় প্রমাণ নিয়েই যদি চিন্তা করত যে, যেই সত্ত্বাকে জ্ঞান ও প্রকৃতিগত শক্তিতে সবচেয়ে শক্তিশালী অনন্য ও অতুলনীয় মানি, সে সকল শক্তির ছাপকেও অনন্য এবং অতুলনীয় স্বীকার করা উচিত।

কেননা, আমরা যেভাবে বর্ণনা করে এসেছি, কথা বা বাণীর মাহাত্ম্য ও প্রতাপ, বক্তার জ্ঞানগত শক্তির অধীনস্ত। জ্ঞানের শক্তিতে যে অধিক শক্তিশালী তার বক্তৃতার মাহাত্ম্য ও প্রতাপও অধিক হয়ে থাকে। আর যদি এই প্রমাণকেও অবজ্ঞা করে থাকে তাহলে হায়! তারা যদি বস্তুর বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্যের সত্যতার কথা স্মরণ রাখত! তারা কি জানে না যে শত শত জিনিস একই প্রকারের হয়ে থাকে বরং একই শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক (খোদা) প্রত্যেক বস্তুতে পৃথক পৃথক বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন।

কিছু মানুষ এই আত্মপ্রতারণায় নিমগ্ন যে, কথা বা ভাষা মানুষের আবিস্কার! যেখানে তা মানুষের আবিস্কার হলো সেখানে কথা বা বাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় বাগ্মিতা ও বাক্যালঙ্কার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ঠত্বে প্রয়োজনে মানুষ সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে!

কেননা, মানুষ স্বীয় আবিস্কারে উন্নতি করতে অক্ষম ও ব্যর্থ থাকবে এ কথা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক ও অকল্পনীয় ! বাণীর বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতায় সকল প্রকার উন্নতি করা ও পরম মার্গে উপনীত হওয়া যেখানে বিবেকের কাছে অসম্ভব নয় সেখানে কুরআনের আলঙ্কারিকতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করাও অসম্ভব হবে না!

অতএব, স্পষ্ট হওয়া উচিত যে এই সন্দেহ প্রধানত: আমাদের এই উপরোল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে দূরীভূত হয়ে যায় যাতে আমরা অত্যন্ত পরিস্কারভাবে লিপিবদ্ধ করেছি যে, মানুষের জ্ঞানগত শক্তিসমূহ কোনভাবেই খোদা তা'লার জ্ঞানগত শক্তির সমান হতে পারে না আর জ্ঞান-শক্তির ক্ষেত্রে তুচ্ছ-উচ্চ, শক্তিশালী ও দুর্বলের মাঝে যে পার্থক্য থেকে থাকে তা কথায় বা বাণীতে প্রকাশ পাওয়া অবধারিত। অর্থাৎ যে বাণী বা গ্রন্থ মহান শক্তি হতে উৎসারিত তা উচ্চ আর যা নিম্নমানের শক্তি থেকে উৎসারিত হয়েছে তা নিম্ন মানের বা তুচ্ছ, যেমনটি কি-না ভিন্ন-ভিন্ন যোগ্যতার মানুষের সামর্থের ওপর দৃষ্টিপাতে এই পার্থক্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও প্রকাশিত।

শক্তিবৃত্তিতে দুর্বল ব্যক্তি দৃঢ় ব্যক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে না অথচ (মানুষ হিসেবে) সব মানুষ একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া এ ধারণাও সঠিক নয় যে সব ভাষা মানুষেরই আবিস্কার বরং পরম গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত যে আবিস্কারক ও স্রষ্টা সেই সর্বশক্তিমান খোদা-ই, যিনি স্বীয় উৎকৃষ্ট ক্ষমতার বলে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলার সামর্থ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে ভাষা দিয়েছেন।

ভাষা যদি মানুষের আবিস্কার হতো তাহলে কোন সদ্যজাত শিশুর ভাষা শিক্ষার কোন প্রয়োজন হতো না বরং প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সে নিজেই কোন ভাষা আবিস্কার করে নিত কিন্তু যুক্তির নিরিখে এটি অতি স্পষ্ট যে যদি কোন শিশুকে ভাষা না শিখানো হয় তাহলে সে কিছুই বলতে পারবে না। তুমি সেই শিশুকে গ্রীসের কোন জঙ্গলেও যদি লালন-পালন কর বা ইংল্যান্ডের কোন দ্বীপে ছেড়ে দাও বা তুমি তাকে বিষুব রেখার নীচেই নিয়ে যাও না কেন, ভাষার ক্ষেত্রে সে শিক্ষার মুখাপেক্ষী হবেই আর না শিখালে সে ভাষাহীন থেকে যাবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে এই সন্দেহ উপস্থাপন করা যে আমরা সচক্ষে দেখি যে, ভাষায় সর্বদা শত-শত প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন নিজ থেকেই হতে থাকে যার মাধ্যমে ভাষায় মানুষের হস্তক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া যায়! স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এই সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রতারণার শামিল। ভাষায় সব সময় যে পরিবর্তন হচ্ছে তা মানুষের ঐচ্ছিক নয় আর এটি কোন নিয়ম হিসেবে নির্ধারিত হতে পারে না যে স্বয়ং মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব বিশেষ বিশেষ সময়ে ভাষায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে থাকে।

বরং গভীর দৃষ্টিপাতে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এই পরিবর্তনও সব কারণের আদি কারণ অর্থাৎ খোদার ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে, যেভাবে সকল স্বর্গীয় ও পার্থিব পরিবর্তন-পরিবর্ধন

তার বিশেষ ইচ্ছায় প্রকাশিত। এটি কখনও প্রমাণিত হতে পারে না যে পৃথিবীতে যত ভাষা রয়েছে সকল ভাষা সম্মিলিতরূপে বা পৃথক পৃথকভাবে মানুষ আবিস্কার করেছিল।

যদি কেউ এই সন্দেহ উপস্থাপন করে যে, যেখানে স্বাভাবিকভাবে খোদাতালা ভাষায় সবসময় পরিবর্তন করে থাকেন সেখানে এমন ধারণা করা কেন বৈধ হবে না যে, প্রারম্ভেও হয়ত কোন এলহামই হয়নি আর এভাবেই বিভিন্ন ভাষা আবিস্কৃত হয়ে থাকবে?

এর উত্তর হলো প্রারম্ভিক যুগের জন্য প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম হলো, খোদা তা'লা সবকিছুকে স্বীয়

নিরঙ্কুশ শক্তির বলে সৃষ্টি করেছিলেন। আকাশ, পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র আর স্বয়ং মানুষের ফিতরতের ওপর দৃষ্টিপাতে বোঝা যাবে, সেই প্রাথমিক যুগ শুধু শক্তি প্রদর্শনের যুগ ছিল।

যাতে প্রচলিত বা সাধারণ উপকরণের কোন মিশ্রণ ছিল না। আর সে যুগে যা কিছু খোদা তা'লা সৃষ্টি করেছেন তা এমন মহান কুদরত বা শক্তির মাধ্যমে করেছেন যা দেখে মানব হতভম্ব। পৃথিবী, আকাশ, সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদী ইত্যাদি গ্রহ-উপগ্রহের ওপর দৃষ্টিপাত করে দেখ কিভাবে এত বড় কাজ কোন উপকরণ, নির্মাণ-শিল্পী এবং শ্রমিকদের সাহায্য ছাড়া শুধু ইচ্ছার ভিত্তিতে নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমেই সাধন করলেন?

সুতরাং প্রারম্ভিক যুগে খোদার পুরো কাজ যেখানে তার ক্ষমতা ও শক্তির বলে সাধিত হতে দেখা যায় যা প্রকৃতির ও উপকরণের মিশ্রণ হতে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র এবং সম্পূর্ণভাবে ঐশী ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে সেখানে ঈমানহীনদের মত ভাষা সম্পর্কে খোদাকে কীভাবে এবিষয়ে অক্ষম মনে করা যেতে পারে?

যেখানে তিনি সবকিছু নিছক শক্তি বা কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছিলেন সেখানে তিনি ভাষা সৃষ্টির করার শক্তি রাখতেন না! যিনি স্বয়ং মানুষকে পিতামাতা ছাড়া সৃষ্টি করে স্বীয় পূর্ণ শক্তিমত্তার প্রমাণ দিয়েছেন, সেখানে ভাষা সম্পর্কে কেন তাঁর কুদরত বা শক্তিকে অসম্পূর্ণ মনে করা হবে? এক কথায়, যেখানে সকল বুদ্ধিমানকে স্বীকার করতে হয় যে প্রথম যুগ খাঁটি শক্তিমত্তা প্রদর্শনের যুগ ছিল আর তাতে প্রকৃতির সার্বজনীন নিয়ম ছিল সকল কাজ প্রচলিত বা সাধারণ উপকরণের মিশ্রণ ছাড়া সাধন করা; সুতরাং ভাষাকে এই সাধারণ ও সার্বজনীন নিয়ম হতে বের করে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার শামিল।

সে যুগের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এযুগের অবস্থা উপস্থাপন করা সঠিক নয়। যেমন এখন মানব সন্তান পিতামাতার মাধ্যম ছাড়া জন্ম নিতে পারে না। কিন্তু যদি এই প্রাথমিক যুগেও মানুষের জন্ম পিতামাতার অস্তিত্বের ওপরই নির্ভরশীল হতো তাহলে এপৃথিবী সৃষ্টি হওয়া কিভাবে সম্ভব হতো? এছাড়া ভাষায় প্রকৃতিগতভাবে যেই পরিবর্তন ঘটে থাকে সে সকল পরিবর্তনে

এবং এই দ্বিতীয় রূপে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে শূণ্য হতে ভাষা সৃষ্টি করার মাঝে বড় পার্থক্য রয়েছে।

বর্তমান কোন সচল ভাষায় কোন পরিবর্তন আসা এক বিষয় আর সকল দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ভাষার সম্পূর্ণভাবে শূণ্য হতে সৃষ্টি হওয়া ভিন্ন কথা। এসব কথা ছাড়াও যেখানে এখনও খোদা তা'লা স্বীয় এলহামের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষা স্বীয় বান্দাদের প্রতি এলকা করে থাকেন বা তাদের হৃদয়ে সঞ্চার করেন আর এমন সব ভাষায় এলহাম করতে পারেন যেসব ভাষার সেসব বান্দাদের কোন জ্ঞানই থাকে না; যেভাবে আমরা টিকা পাদটিকা নং ১-এ এর প্রমাণ দিয়েছি।

সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে এই ধারণা করা কত বড় নির্বুদ্ধিতার শামিল যে, জ্ঞানের মূর্তপ্রতীক খোদাতালার আদিতে এই এলকা করার বা প্রেরণা সঞ্চারের পূর্ণ শক্তি ছিল না; কেননা যেখানে বা যে অবস্থায় তাঁর সীমাহীন শক্তির এখনও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় অর্থাৎ তিনি স্বীয় বান্দাদের এমন এমন ভাষায় এলহাম করেন, যা সম্পর্কে সেই সব বান্দা সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত আর যা তারা নিজেদের পিতামাতার কাছেও শিখেননি আর কোন শিক্ষকের কাছেও শিক্ষা পান নি।

তাহলে কারণ কী যে, সৃষ্টির সূচনায় মানুষকে ভাষা শিক্ষা দেয়া খোদা তা'লার উৎকর্ষ কুদরতের জন্য অসম্ভব জ্ঞান করা হবে– যা ছিল একান্ত মুখাপেক্ষীতার যুগ? আর কেন খোদাকে দুর্বল ও অক্ষম আখ্যায়িত করে মানুষের ওপর এত সমস্যা আনয়ন করা হবে আর এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একথা বলা হবে যে মানুষ সৃষ্টি হয়ে দীর্ঘকাল বোবা ও ভাষাহীন ছিল আর সেই দুর্ভাগ্যের যুগে শতশত সমস্যা ও বিপদাপদের মাঝে কেবল ইঙ্গিতে কার্য সাধন করতে থাকে আর যে সকল দীর্ঘ বক্তৃতা বা সূক্ষ্ম বিষয়াদী ইঙ্গিতে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি তা প্রকাশে ব্যর্থ হয়ে সে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির বোঝা বহন করতে থাকে যা সে সকল বক্তৃতা না বোঝা ও বোঝাতে না পারার কারণে দেখা দেয়া আবশ্যক ছিল।

আর মানুষ যেসব কষ্টের সম্মুখীন হয় সেসকল কষ্টভোগ সত্ত্বেও খোদা তার ব্যথার কোন সুরাহা করলেন না আর তার চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খোদা স্বীয় পূর্ণ শক্তির বলে যদিও মানুষকে শূণ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তাকে ভাষা শিখিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন কান দিয়েছেন আর বিভিন্ন প্রকার উন্নতি করার সামর্থ দিয়েছেন, অনুরূপভাবে স্বীয় পূর্ণ শক্তির কল্যাণে এত নিয়ামতরাজি দান করেছেন যা মানুষ গণনা করেও শেষ করতে পারে না; কিন্তু সেই কাদের খোদা মানুষকে ভাষা শিক্ষা দিতে পারেন নি, যা মানুষের জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল!

এমনকি মানুষ দীর্ঘদিন ভাষাহীনতার সমস্যায় জর্জরিত থেকে নিজেই ভাষা আবিষ্কার করেছে! এটিকি এমন বিশ্বাস যার মাধ্যমে খোদার খোদায়ীর শক্তি প্রশংসার যোগ্য হতে পারে? কোন বিশ্বাসী সেই সম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান (খোদা) সম্পর্কে এমন কুধারণা পোষণ করতে পারে কি, যে তিনি শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এখনও আদি কালেই রয়ে গেছেন? যখন ঈশরত্বের শক্তিনিচয় অজ্ঞ বান্দাদের সামনে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল, কতক আবশ্যকীয় শক্তি প্রদর্শনে ব্যর্থ থাকেন।

এটি কি ভাবা যায় যে, যিনি কয়েক হাজার সৃষ্টিকে কোন বস্তু ও আকৃতির (কাঠামো) সাহায্য নেয়া ছাড়াই সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন তিনি ভাষা আবিস্কারের শক্তি রাখবেন না? যিনি মানুষকে একটি মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন আর স্বীয় বিশেষ ইচ্ছায় তাকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বানিয়েছেন তিনি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ ছেড়ে দেবেন আর মানুষ দৈবক্রমে স্বীয় ঘাটতি নিজেই পূর্ণ করবে– কোন বিবেক একথা গ্রহণ করতে পারে কি?

প্রশ্ন হলো যে সত্ত্বার আদি থেকে এ সকল ভাষার জ্ঞান রয়েছে যার গভীর দৃষ্টির সামনে ভবিষ্যতে অস্তিত্ব লাভকারী সবকিছু কার্যত এখনই বিদ্যমান হওয়ার অর্থ বা মর্যাদা রাখে আর যার পূর্ণ কুদরত সকল প্রকার শিক্ষা ও জ্ঞান দিতে পারে, তিনিই সেই সত্ত্বা যার সম্পর্কে ধরে নেয়া হবে যে তিনি জেনেশুনে মানুষকে ভাষাহীন পেয়ে তাকে ভাষা শিক্ষা দিতে দ্বিধা-দ্বন্দে লিপ্ত হন!

এমন কী মানুষ তার মনোযোগের অভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পশু ও বন্যদের ন্যায় জীবন কাটাতে থাকে আর অবশেষে তার (অর্থাৎ মানুষের) নিজেরই এই উপলব্ধি হয় যে কোন ভাষা আবিস্কার করা উচিত। এ ধারণার মিথ্যা হওয়াটা এতই স্পষ্ট যে, খোদার সে সকল কামেল শক্তি ও পরম করুনা উৎকৃষ্ট তরবিয়ত বা শিক্ষাপ্রদান যা সকলযুগে দৃশ্যমান তা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।

যেই খোদার এলহামে ব্যবহৃত ভাষার বিস্ময়কর দিকগুলোর মাঝে এখনও যা দেখা যায় তা হলো তা অজানা সব ভাষা বান্দাদের সামনে প্রকাশ করে, তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা যে, যুগের সূচনাতে– যখন এলহামের একান্ত প্রয়োজন ছিল, খোদা এলহাম করার বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দে লিপ্ত ছিলেন! এমনটি মনে করা চরম অজ্ঞতা ও হৃদয়ের অন্ধত্বের প্রমাণ।

কারো হৃদয়ে যদি এই ধারণা জাগ্রত হয় যে বন্য লোকদের যারা ভাষা না থাকার কারণে কেবল ইশারা ইঙ্গিতে কাজ চালায় তাদেরকে এলহামের মাধ্যমে কোন ভাষা সম্পর্কে কেন অবহিত করা হয় না আর কেনই বা কোন নবজাত শিশু জঙ্গলে রাখলে খোদার পক্ষ থেকে কোন এলহাম লাভ করে না? এর উত্তর হলো, এটি খোদার গুণাবলী সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা, কেননা 'এলকা' ও 'এলহাম' এমন বিষয় নয় যা সর্বত্র, অকালে-অস্থানে যোগ্যতার বিবেচনা ছাড়াই হয়ে যাবে বরং এলকা ও এলহামের জন্য যোগ্যতারূপী বৈশিষ্ট্য থাকা অত্যাবশ্যক এক শর্ত।

দ্বিতীয় আবশ্যকীয় শর্ত হলো-এই এলহামের সত্যিকার প্রয়োজনিয়তা, প্রথম দিকে খোদা যখন মানব সৃষ্টি করেছেন তখন এলহামের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা প্রদান করা এমন একটি বিষয় ছিল যাতে উভয় প্রকার শর্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রধানত মানুষের মাঝে যেমনটি এলহাম লাভের জন্য ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকা উচিত তা

বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে সত্যিকার প্রয়োজনও এলহামের দাবিদার ছিল।

কেননা, সে সময় হযরত আদমের প্রতি স্নেহশীল সাথী খোদা তা'লা ছাড়া আর কেউ ছিল না, যে তাকে কথা বলা শিখাবে আর শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে সভ্যতা-ভব্যতা শিখাবে। বরং হযরত আদমের জন্য কেবল খোদা তা'লা ছিলেন যিনি আদমের সকল আবশ্যকীয় চাহিদা পুরণ করেছেন। তিনি আল্লাহ্ স্বয়ং সুন্দর শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-ভব্যতা শিখিয়ে সুশিষ্ট মানুষের স্তরে পৌঁছিয়েন। অবশ্য এরপর হযরত আদমের সন্তানরা সারা পৃথিবীতে যখন বিস্তৃতি লাভ করেছে আর আল্লাহ্ তা'লা আদমকে যেই জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন তা তাঁর সন্তানসন্ততিতে যথাযথভাবে সঞ্চারিত হতে থাকে। তখন কতক মানুষ কতকের শিক্ষক ও ওস্তাদের ভূমিকা পালন করে।

ভাষা শিক্ষা দেয়ারক্ষেত্রে প্রত্যেক শিশুর জন্য তার পিতামাতা স্নেহশীল সাথী হিসেবে দৃশ্যপটে আসেন। কিন্তু আদমের জন্য এক খোদা ছাড়া আর কেউ ছিলনা, যে তাকে ভাষা শিক্ষা দিতো এবং মানবিক ভদ্রতা-শিষ্টাচার শিখাতো, তার জন্য শিক্ষক, ওস্তাদ ও পিতা-মাতার পরিবর্তে একা খোদাই ছিলেন যিনি তাকে সৃষ্টি করে নিজেই সবকিছু তাকে শিখিয়েছেন। এক কথায় খোদার স্বয়ং আদমের তরবিয়ত করা ও তার চাহিদা পূরণ করা এক আবশ্যকীয় ও সত্যিকার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু তার সন্তান সন্ততির জন্য এর প্রয়োজন দেখা দেয়নি কেননা এখন কোটী কোটী মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং সন্তানসন্ততিকে শিখায়। এছাড়া আমরা যেভাবে এখন বর্ণনা করে এসেছি যে ব্যক্তিগত যোগ্যতাও এলহাম লাভের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত, যা আদম সন্তানদের প্রত্যেকের মাঝে পাওয়া যায় না। কারো ভিতর যদি ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকে তাহলে আজও সে এলহামের মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় বিষয়ে খোদা তা'লা হতে সংবাদ পেতে পারে আর খোদা তাকে আদৌ ব্যর্থ হতে দেন না, পরিত্যাগ করেন না।

খোদার সুগভীর দৃষ্টি সব মানুষের যোগ্যতা-সামর্থের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি যোগ্যদের স্বীয় যোগ্যতা বা সামর্থ প্রকাশ করা হতে বঞ্চিত রাখেন না। আর এমনটি কখনও হয় না যে, এক ব্যক্তি খোদার দৃষ্টিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের আর ওলায়েত, নবুয়্যত ও রিসালত লাভের যোগ্যতা রাখবে এর পর জাগতিক দুর্বিপাকের কারণে বা জংলী অর্থাৎ যথা-তথা জন্ম গ্রহেণের কারণে সেই অবস্থায় মারা যায় আর খোদা তাকে মহান মর্যাদায় না পৌছান যেখানে পৌছার যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে। সত্যিকার অর্থে জংলী নিরক্ষর, বন্য ও অজ্ঞ সে ব্যক্তিই থেকে যায় যে নিজ প্রকৃতিতে অসম্পূর্ণ, বাজে ও চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়।

এছাড়া যেখানে খোদা কোটি কোটি মানুষকে বিভিন্ন প্রকার ভাষা ও অভিব্যক্তি দান করে সাধারণ শিক্ষার দ্বার অন্যদের জন্য উন্মোচন করেছেন, সেখানে কোন নিদর্শন প্রকাশ করার মানসে বিশেষ পরিস্থিতির যদি দাবী না থাকে তাহলে এলহামের মাধ্যমে ভাষা শিখার কোন প্রয়োজন নেই।

আর খোদা তা'লা, প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতিক। তিনি প্রয়োজন ছাড়া কোন কাজ করেন না আর বৃথা ও অলাভজনক রীতিগুলো অনর্থক অবলম্বন করেন না।

কোন কোন নির্বোধ আর্য একমাত্র সংস্কৃত ভাষাকে পরমেশ্বরের ভাষা আখ্যা দিয়ে বাকী সকল ভাষা যা স্রষ্টার শত-শত সৃষ্টিশৈলী বা বিস্ময়াবলীতে পরিপূর্ণ, সেসবকে মানুষের আবিস্কার আখ্যা দেয় যেন মানুষের হাতেও এক ধরণের ঈশ্বরত্ব রয়েছে ;অর্থাৎ পরমেশ্বর কেবল একটি ভাষা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মানুষ এমন শক্তি বা যোগ্যতা দেখিয়েছে যে তারা (সংস্কৃত ভাষার) চেয়ে উত্তম বহু ভাষা আবিস্কার করেছে। আমরা আর্যদের জিজ্ঞেস করি যে, যদি একথাই সত্য হয়ে থাকে যে একমাত্র সংস্কৃতই পরমেশ্বরের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে আর অন্যান্য ভাষা মানুষের সৃষ্টি পরমেশ্বরের মুখ থেকে দূরে পড়ে রয়েছে, তাহলে বল সেই বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বগুলো কী-কী যা কেবল সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে আর অন্য ভাষায় নেই?

কেননা, মানবীয় সৃষ্টির উপর অবশ্যই পরমেশ্বরের বাণী বা উক্তির শ্রেষ্ঠত্ব থাকা উচিত। স্বীয় সত্তায়, গুণাবলী ও কর্মে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অনন্য ও অতুলনীয় হওয়ার কারণেই তিনি খোদা। যদি আমরা ধরে নেই যে, সংস্কৃত পরমেশ্বরের ভাষা যা হিন্দুদের পিতা-পিতামহের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর অন্যান্য ভাষা অন্যদের পিতা-পিতামহরা নিজেরাই বানিয়েছে, কেননা তারা হিন্দুদের চেয়ে বেশী বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিল?

কিন্তু একই সাথে আমরা কি এটিও ধরে নিতে পারি যে তারা পরমেশ্বর হতে কিছুটা বড় ছিল, যাদের পরমোৎকর্ষ শক্তি শতশত উন্নত ভাষা বানিয়ে দেখিয়েছে কিন্তু পরমেশ্বর কেবল একটি ভাষা বানিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। যাদের শিরা-উপশিরায় বহু ঈশ্বরে পূজা বদ্ধমূল হয়ে গেছে তারা তাদের পরমেশ্বরকে অনেক কথায় সমপর্যায়ের এক মানুষ মনে করে বসে আছে। আর কেনই বা হবে না? তিনি যে অনাদি! খোদার শরীক যে সেজে বসেছেন! কারো হৃদয়ে যদি এই সন্দেহ জাগে যে খোদা একটি ভাষাতেই সন্তুষ্ট থাকলেন না কেন? অতএব, এই সন্দেহ ও চিন্তা প্রণিধান শক্তির দুর্বলতা হতে উদ্ভুত।

কোন বুদ্ধিমান, বিভিন্ন মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন প্রকৃতির উপর দৃষ্টিপাত করে ভাবলে, নিশ্চিৎভাবে সে জানতে পারবে যে, একই ভাষা সবার অবস্থার সাথে সমানভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না বরং কোন কোন দেশের মানুষ কোন কোন প্রকার শব্দ ও অক্ষর সহজেই উচ্চারণে সক্ষম। আবার কোন কোন দেশের মানুষের জন্য সেসব অক্ষর ও শব্দ উচ্চারণ করা একটি বড় সমস্যা।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

জুমুআর খুতবা

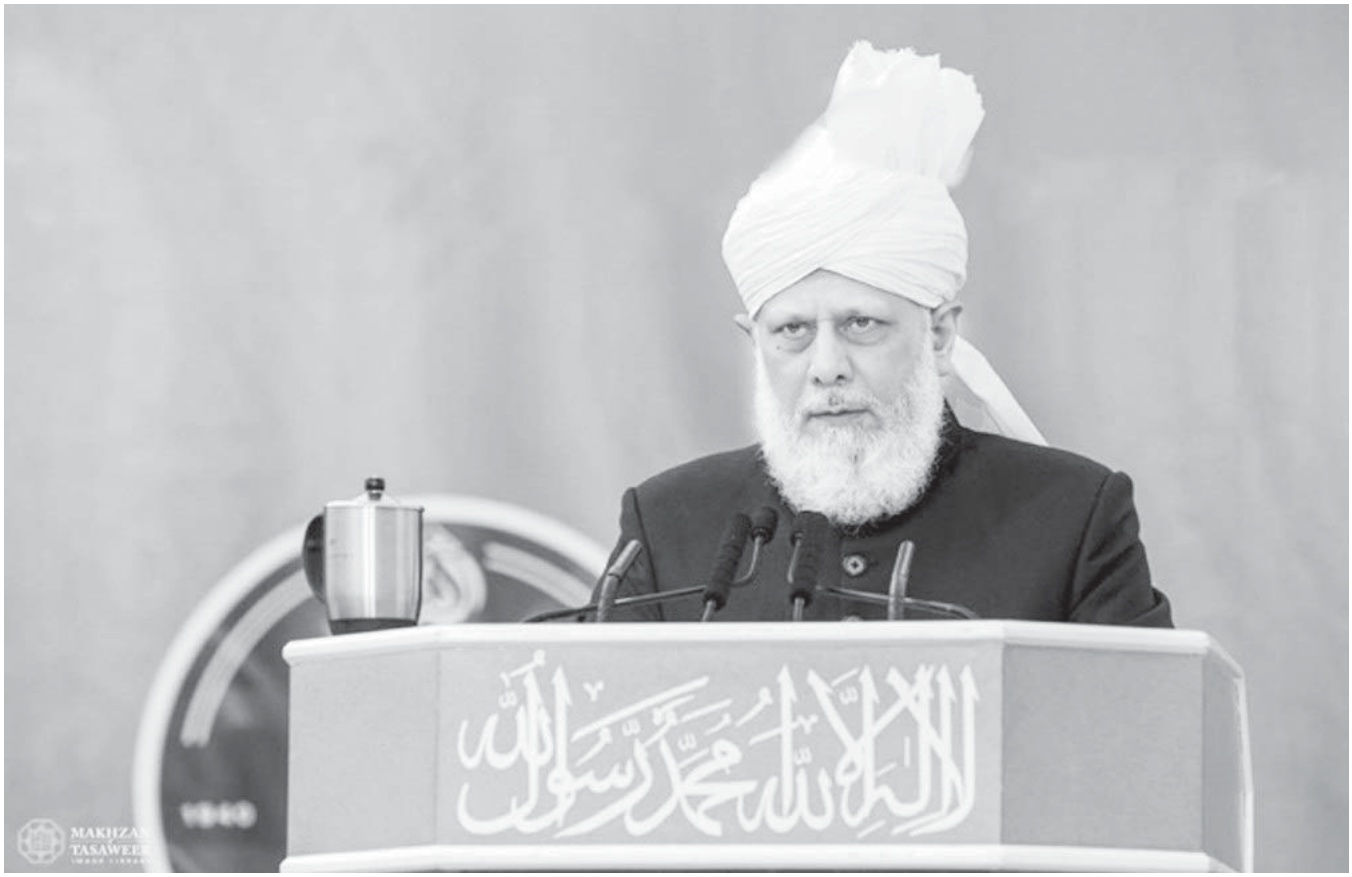

খাতামান্নাবীঈনের প্রকৃত তাৎপর্য

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ অক্টোবর ২০১৭'র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

(সূরা আল্ আহযাব: ৪১)

এ আয়াতের অনুবাদ হলো, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্‌র নবী এবং খাতামান নবীঈন আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

পাকিস্তানে বিভিন্ন সময় কোন না কোন অজুহাতে আহমদীদের বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদ এবং আলেম সমাজ বিষোদগার করে থাকে। তাদের মতে এটি হচ্ছে, জাতিকে সমমনা বানিয়ে নিজেদের পিছনে চালানোর এবং খ্যাতি অর্জনের সবচেয়ে সহজ পন্থা।

আর মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো, 'খতমে নবুয়্যত'-এর অস্ত্র। অতএব কোন রাজনৈতিক দল যখন দুর্বল হতে থাকে,

পাকিস্তানে বিভিন্ন সময় কোন না কোন অজুহাতে আহমদীদের বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদ এবং আলেম সমাজ বিষোদগার করে থাকে। তাদের মতে এটি হচ্ছে, জাতিকে সমমনা বানিয়ে নিজেদের পিছনে চালানোর এবং খ্যাতি অর্জনের সবচেয়ে সহজ পন্থা।

আর মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো, 'খতমে নবুয়্যত'-এর অস্ত্র। অতএব কোন রাজনৈতিক দল যখন দুর্বল হতে থাকে, কোন রাজনীতিবিদের জনপ্রিয়তা যখনই হ্রাস পেতে থাকে এবং নামসর্বস্ব ধর্মীয় সংগঠনগুলো যখন রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা লাভ করতে চায় এবং অন্যান্য সংগঠন, রাজনৈতিক দল বা অন্য কোন রাজনীতিবিদকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় তখন আহমদীদের সাথে তাদেরকে জড়িয়ে বলে, দেখ! কত বড় অন্যায় হচ্ছে, বিদেশী শক্তির প্রভাবে এরা আহমদীদেরকে মূলধারার (Main Stream) মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় বা করছে। অথচ তাদের ধারণা অনুসারে আহমদীরা খতমে নবুয়্যত মানে না।

কোন রাজনীতিবিদের জনপ্রিয়তা যখনই হ্রাস পেতে থাকে এবং নামসর্বস্ব ধর্মীয় সংগঠনগুলো যখন রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা লাভ করতে চায় এবং অন্যান্য সংগঠন, রাজনৈতিক দল বা অন্য কোন রাজনীতিবিদকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় তখন আহমদীদের সাথে তাদেরকে জড়িয়ে বলে, দেখ! কত বড় অন্যায় হচ্ছে, বিদেশী শক্তির প্রভাবে এরা আহমদীদেরকে মূলধারার (Main Stream) মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় বা করছে। অথচ তাদের ধারণা অনুসারে আহমদীরা খতমে নবুয়্যত মানে না। এই নামধারী ইসলাম প্রেমিরা দাবি করে যে, রসূলের সম্মানে আমরা কোন ধরনের আঁচ আসতে দিব না আর কখনো এমন অন্যায় হতে দিব না। আহমদীদের মুসলমান হিসেবে গণ্য করা– এটি মস্ত বড় অন্যায়! সেই সাথে তারা একথাও বলে যে, এজন্য (এর প্রতিবাদে) আমরা আমাদের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত আছি। প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় দল, ক্ষমতাসীন হলেও, কালক্ষেপণ না করে তাদের প্রতিনিধি সংসদে দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তরে বিবৃতি দেয় যে, আহমদীদেরকে কোন অধিকার দেয়ার প্রশ্নই উঠে না, বরং একজন পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে, হোক না কেন তা তৃতীয় শ্রেণির, অল্প বিস্তর বা যৎকিঞ্চিৎ যে অধিকারই তারা পাচ্ছে, এবারে তাও হরণ করার দাবী উত্থাপন করা হবে। সবারই উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রত্যেকেরই রয়েছে। কিন্তু কোন প্রকার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও এতে আহমদীদেরকেই জড়ানো হয়। কেননা এটি হলো সবচেয়ে সহজ কাজ। সরকারী বা বিরোধী দলীয় সাংসদরা সংসদে প্রতিযোগিতামূলকভাবে আহমদীদের বিরুদ্ধে খেদোক্তি করতে থাকে।

সম্প্রতি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতাসীনরা আইনের ধারায় নিজেদের স্বার্থে শাব্দিক যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, এ ক্ষেত্রেও আমরা এসব কিছুই দেখছি। পাকিস্তানে সম্প্রতি খুব হৈচৈ হয়েছে আর প্রচারমাধ্যমের সুবাদে এসব কিছু বিশ্ব সমক্ষে প্রকাশ পেয়েছে, তাই এ সম্পর্কে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

এ প্রেক্ষাপটের সাথে আহমদীয়া জামা'তের সম্পর্ক যতটুকু তা হলো, বিদেশী কোন শক্তিকে আমরা কখনো বলিনি যে, পাকিস্তানি আইনে পরিবর্তন এনে, আইনের দৃষ্টিতে আমাদেরকে মুসলমান বানানো হোক আর আমরা পাকিস্তানি কোন সরকারের কাছেও কখনো এর ভিক্ষাও চাই নি। কোন সংসদ বা সরকারের কাছে মুসলমান আখ্যায়িত হওয়ার জন্য আমাদের কোন সনদ বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। আমাদের দাবি হলো, 'আমরা মুসলমান'। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে মুসলমান আখ্যায়িত করেছেন, তাই আমরা মুসলমান। আমরা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

কলেমা পাঠকারী। আমরা ইসলামের সকল রুকন এবং ঈমানের সকল স্তম্ভে বিশ্বাস রাখি। আমরা পবিত্র কুরআনে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখি। মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি। যেমনটি কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন আর যে আয়াতটি আমি এখনই পাঠ করেছি। আমরা অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে এ কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান নবীঈন। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পরিষ্কার করে এবং সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন আর বিভিন্ন জায়গায় এটি স্পষ্ট করেছেন, যে ব্যক্তি খতমে নবুয়্যত মানে না আমি তাকে বেদ্বীন এবং ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত মনে করি। সে আহমদীও নয় আর মুসলমানও নয়। অতএব আমাদের বিরুদ্ধে যে হইচই করা হয় আর এই মর্মে যে অপবাদ আমাদের প্রতি আরোপ করা হয় যে, আমরা খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী না এবং নাউযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন হিসেবে মানি না, এটি নিতান্তই এক হীন এবং ঘৃণ্য অপবাদ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির যুগ থেকেই আহমদীয়া জামা'তের এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ওপর এই অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে। আর বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে তাদের উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে থাকে। আর যেমনটি আমি বলেছি,

সম্প্রতি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতাসীনরা আইনের ধারায় নিজেদের স্বার্থে শাব্দিক যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, এ ক্ষেত্রেও আমরা এসব কিছুই দেখছি।

বিভিন্ন সময়, যখনই স্বার্থসিদ্ধি করতে হয়, তখন এ বিষয়ে এসব লোকের ভেতর উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর এক খুতবায় একবার বলেছিলেন, আমাদের প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হয় এটিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে যখন আমরা বলি যে, আমরা কীভাবে খতমে নবুয়্যতের অস্বীকারকারী হতে পারি? আমরা তো কুরআন পড়ি আর কুরআনে দৃঢ়বিশ্বাস ও ঈমান রাখি। আর কুরআন মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন আখ্যা দেয়। তখন অ-আহমদী আলেমরা এই আপত্তি উত্থাপন করে এবং জনসাধারণকেও তারা এপাঠই দিয়েছে আর আজও এই আপত্তিই করা হয় বরং যোগাযোগের সুবিধার কারণে প্রচার মাধ্যমের সুবাদে অন্যান্য দেশের আলেম সমাজ ও নামধারী পাকিস্তানি এসব আলেমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বলে বসে, নাঊযুবিল্লাহ্! আহমদীরা পবিত্র কুরআনও মানে না। মির্যা সাহেবের ইলহামকেই তারা কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করে। (খুতবাতে মাহমুদ (রা.), ৪ নভেম্বর, ১৯৫৫ সনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ৩৬তম খণ্ড, পৃ: ২২২-২২৩)

অথচ আহমদীয়াতের সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর অনেক আরব যখন বয়আত করে জামাতভুক্ত হয় তখন তারা একথাই বলে যে, আমরা আমাদের আলেমদের যখন জিজ্ঞেস করি, আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে তাদের মতামত কী? তখন তারা এ ধরনের কথাই শোনায় যে, আহমদীরা পবিত্র কুরআন মানে না, এরা এক পৃথক কুরআন এবং কিতাব বানিয়ে রেখেছে। এরা মহানবী (সা.)-কে শেষ নবী মানে না বরং মির্যা সাহেবকে শেষ নবী মানে। এদের হজ্জ ভিন্ন, এরা হজ্জ করে না, এদের ক্বিবলা ভিন্ন, এরা কাবা ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়ে না। তারা আরো বলেন (অর্থাৎ আরব আহমদীরা), আমরা যখন খতিয়ে দেখি তখন আমাদের সামনে এসব আলেমের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। অ-আহমদী মৌলভীদের এসব মিথ্যাচার ও আহমদীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ শত শত মানুষের জন্য আহমদীয়াত গ্রহণের কারণ হয়ে যায়। অতএব মৌলভীরা মিথ্যা বলে এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের তবলীগই করছে।

এটি কীভাবে হতে পারে যে, আমরা কুরআন মানব না আর মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন হিসেবে বিশ্বাস করব না! যেখানে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহাম কুরআনকে আল্লাহ্‌র কিতাব ঘোষণা দেয়, একেই সকল কল্যাণের উৎস আখ্যায়িত করে এবং মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন বলে। যেমন, পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তাঁর একটি ইলহাম হলো,

الخير كله في القران

অর্থাৎ, সকল কল্যাণ কুরআনেই নিহিত। (আনজামে আথম, রূহানী খাযায়েন, ১১তম খণ্ড, পৃ: ৫৭) অনুরূপভাবে, তিনি (আ.) একথাও বলেছেন, কুরআনকে যে সম্মান দিবে সে আকাশে বা ঊর্ধ্বলোকে সম্মান লাভ করবে। (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ১৩)

তিনি কোথাও বলেন নি যে, আমার ইলহামগুলোকে সম্মান কর। তাঁর ইলহাম সমূহ কুরআনের সেবক, এগুলোর স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা নেই। আমাদের যে কল্যাণই সন্ধান করতে হয়, যে হিদায়াতই অন্বেষণ করতে হয় এবং সমাজের যে কোন বিষয়ে নির্দেশনা নিতে হয়, তা আমরা পবিত্র কুরআন থেকেই নিয়ে থাকি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেক ইলহামও এসব বিষয়কে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করে। অনুরূপভাবে, মহানবী (সা.)-এর খাতামান নবীঈন হওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলীও রয়েছে। এছাড়া একটি ইলহামও রয়েছে যাতে 'খাতামান নবীঈন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেই ইলহামটি হলো, 'সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলে মুহাম্মাদীন সাইয়্যেদে উলদে আদামা ওয়া খাতামিন নাবীঈন' অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধরদের প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, যিনি আদম-সন্তানদের নেতা ও খাতামুল আম্বিয়া (সা.)। (বারাহীনে আহমদীয়া- ৪র্থ খণ্ড, রূহানী খাযায়েন-১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৭ এর টীকা)

আর এই ইলহামটি বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রতি দু'তিনবার অবতীর্ণ হয়েছে। আরো একটি ইলহাম রয়েছে আর তাহলো, **'কুল্লুবারাকাতিম মিন মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'**। অর্থাৎ সকল কল্যাণ মুহাম্মদ (সা.) থেকে উৎসারিত। (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন-২২তম খণ্ড, পৃ: ৭৩)

পুনরায় তিনি তাঁর পুস্তিকা তাজাল্লিয়াতে এলাহীয়া'য় লিখেন, "আমি যদি মহানবী (সা.)-এর উম্মতি না হতাম আর তাঁর (সা.) অনুসরণ না করতাম তাহলে আমার সৎকর্ম পৃথিবীর সকল পর্বত-সমান হলেও আমি বাক্যালাপ ও কথোপকথনের এই সম্মান লাভ করতাম না। কেননা, এখন মুহাম্মদী নবুয়্যত ব্যতিরেকে সকল নবুয়্যতের দ্বার রুদ্ধ।" (তাজাল্লিয়াতে এলাহীয়া, রূহানী খাযায়েন-২০তম খণ্ড, পৃ: ৪১১-৪১২)

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর অধীনস্থ এবং তাঁর সব ইলহামও কুরআনের অধীনস্থ আর কুরআনের ব্যাখ্যামাত্র।

আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলোকে নাঊযুবিল্লাহ্ কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠই জ্ঞান করতাম তাহলে আমরা অর্থ ব্যয় করে এবং

আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে বিশ্বব্যাপী কুরআনের অনুবাদ প্রচার করতাম না বরং এর পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলো প্রচার করতাম। এখন পর্যন্ত ৭৫টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের পুরো অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে আর আরো কয়েকটি ভাষায় অনুবাদকর্ম চলছে। ইনশাআল্লাহ্, অচিরেই তা প্রকাশিত হবে। ১১১টি ভাষায় কুরআনের নির্বাচিত আয়াতের অনুবাদ ছেপে প্রকাশিত হয়েছে।

বড় বড় ইসলামী রাষ্ট্র আর অঢেল সম্পদের মালিক ধর্মীয় সংগঠনগুলো বলুক তো, তারা কতগুলো ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ছেপে প্রচার করেছে?

খাতামান নবীঈনের প্রকৃত অর্থ আর মর্মও কেবল আমরা, আহমদীরাই বুঝি আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খাতামান নবীঈন হওয়া-সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র যে ঘোষণা রয়েছে তার প্রচার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের স্বস্ব ভাষায় কেবল আহমদীরাই করে যাচ্ছে। এরপরও এরা অপবাদ আরোপ করে যে, নাউযুবিল্লাহ্ আহমদীরা খতমে নবুয়্যত মানে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে খতমে নবুয়্যতের সেই মর্ম ও তত্ত্ব বুঝিয়েছেন যার ধারে কাছেও খতমে নবুয়্যতের এসব ধ্বজাধারীরা পৌঁছতে পারে না।

আমরা কি মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি, নাকি মানি না? এ কথা পরিষ্কার করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক বৈঠকে বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত, আমার এবং আমার জামা'তের প্রতি এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আমরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি না, এটি আমাদের প্রতি জঘন্য অপবাদ। আমরা যে দৃঢ়বিশ্বাস, তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া মানি এবং বিশ্বাস করি, এর লক্ষ ভাগের একভাগও অন্যরা মানে না। বরং তাদের মাঝে সেই যোগ্যতাই নেই! খাতামুল আম্বিয়ার খতমে নবুয়্যতে যে নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য নিহিত আছে তারা তা বুঝেই না। তারা পিতৃপুরুষের কাছ থেকে কেবল একটি শব্দই শুনে রেখেছে কিন্তু এর গভীর তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। এরা জানেনা, 'খতমে নবুয়্যত' কাকে বলে আর এর ওপর ঈমান আনার প্রকৃত মর্ম কী! কিন্তু আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে যা সম্পর্কে খোদাই ভাল জানেন, মহানবী (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে খতমে নবুয়্যতের পুরো অর্থ এমনভাবে স্পষ্ট করেছেন যে, এই তত্ত্বজ্ঞানের পানীয় যা আমাকে পান করানো হয়েছে তার এক বিশেষ স্বাদ আমি আস্বাদন করি। এই প্রস্রবণ থেকে যারা পান করেছে তারা ব্যতীত আর কারো পক্ষেই এটি অনুমান করা সম্ভব নয়।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

পুনরায় খতমে নবুয়্যতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই নবী দিয়েছেন যিনি খাতামুল মু'মিনীন, খাতামুল আরেফীন এবং খাতামুন নবীঈন (সর্বশ্রেষ্ঠ মু'মিন, শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী) একইভাবে, সেই গ্রন্থ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যা সব ঐশী শিক্ষার সমাহার ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান নবীঈন আর তাঁর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যত সমাপ্ত হয়েছে। নবুয়্যত এই অর্থে সমাপ্ত হয় নি, যেভাবে কেউ গলাটিপে কাউকে শেষ করে"(বা মেরে ফেলে)। "এমন খতম বা শেষ করা গৌরবের কারণ হয় না বরং মহানবী (সা.)-এর সত্তায় নবুয়্যতের সমাপ্ত হওয়ার অর্থ হলো, স্বাভাবিকভাবে নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ দিকগুলো তাঁর সত্তায় পরম মার্গে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, সেসব বহুবিধ শ্রেষ্ঠত্ব ও পরাকাষ্ঠা যা আদম থেকে আরম্ভ করে মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) পর্যন্ত নবীদের দেয়া হয়েছে, কোনটি কাউকে দেয়া হয়েছে আবার কাউকে অন্য কোনটি, আর এগুলোর সবই একীভূত করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র সত্তায়। আর এভাবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই খাতামান নবীঈন গণ্য হলেন। অনুরূপভাবে, "সেই সমুদয় শিক্ষা" (যত শিক্ষা রয়েছে সব) "ওসীয়্যত" (অর্থাৎ, তাকিদপূর্ণ নির্দেশাবলী) এবং তত্ত্বভাণ্ডার, যা পূর্বের বিভিন্ন পুস্তকে চলে আসছিল (যা পূর্ববতী বিভিন্ন শরীয়তে রয়েছে) "তা কুরআনী শরীয়তে পূর্ণতা লাভ করেছে আর

আহমদীয়া জামা'তের সম্পর্ক যতটুকু তা হলো, বিদেশী কোন শক্তিকে আমরা কখনো বলিনি যে, পাকিস্তানি আইনে পরিবর্তন এনে, আইনের দৃষ্টিতে আমাদেরকে মুসলমান বানানো হোক আর আমরা পাকিস্তানি কোন সরকারের কাছেও কখনো এর ভিক্ষাও চাই নি। কোন সংসদ বা সরকারের কাছে মুসলমান আখ্যায়িত হওয়ার জন্য আমাদের কোন সনদ বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। আমাদের দাবি হলো, 'আমরা মুসলমান'। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে মুসলমান আখ্যায়িত করেছেন, তাই আমরা মুসলমান। আমরা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ কলেমা পাঠকারী। আমরা ইসলামের সকল রুকন এবং ঈমানের সকল স্তম্ভে বিশ্বাস রাখি। আমরা পবিত্র কুরআনে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখি। মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি।

এভাবেই পবিত্র কুরআন খাতামুল কুতুব গণ্য হলো।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪১-৩৪২, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অতএব, এটি সেই সত্য কথা, যে সম্পর্কে আমাদের বিরোধীরা অজ্ঞ, আর তারা যেসব আলেমের খপ্পরে পড়েছে তারা নিজেদের থাবা থেকে এদের বের হতে দেয় না। এই সত্য যদি তাদের অন্ধ অনুসরণকারীরা জেনে যায় তাহলে ধর্মকে যে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে নিয়েছে সে ব্যবসা তাদের আর চলবে না।

এক জায়গায় তিনি (আ.) খাতামান নবীঈনের অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, "খতমে নবুয়্যত সম্পর্কে আমি আবারো বলতে চাই, খাতামুন নবীঈন-এর প্রধান অর্থ হলো, নবুয়্যত-সংক্রান্ত বিষয়াদিকে (আল্লাহ্ তা'লা) আদম থেকে আরম্ভ করে মহানবী (সা.)-এর সত্তায় পূর্ণতা দিয়েছেন, এটি হচ্ছে মোটা ও বাহ্যিক অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ হলো, মহানবী (সা.)-এর সত্তায় নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠত্বের বৃত্ত পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি সত্য আর পরম সত্য কথা যে, পবিত্র কুরআন অসম্পূর্ণ বিষয়াদিকে সম্পূর্ণ করেছে আর নবুয়্যত সমাপ্ত হয়ে গেছে।" [অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অবতীর্ণ যেসব বিষয় ছিল সেগুলোর মান তত উন্নত ছিল না। পবিত্র কুরআন সেই শিক্ষাকে পরম মার্গে পৌঁছে দিয়েছে। আর তাঁর (সা.) প্রতি পবিত্র কুরআনরূপী সেই শরীয়ত অবতীর্ণ করা হয়েছে যার চেয়ে অধিক উৎকর্ষতায় কোন ব্যক্তি বা মানুষের জন্য উপনীত হওয়া সম্ভবই ছিল না, যেখানে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে পৌঁছেছে, আর তা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এখানে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।]" তিনি (আ.) বলেন, "এজন্যই ইসলাম

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

-এর সত্যায়নকারী হয়ে গেছে ও সত্যায়নস্থল হয়ে গেছে (সূরা আল্ মায়েদা: ৪)। বস্তুত এগুলো নবুয়্যতের নিদর্শন, এগুলোর অবস্থা এবং গভীরতা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। মূলনীতি পরিস্কার ও সুস্পষ্ট আর সেগুলো প্রতিষ্ঠিত-প্রমাণিত সত্য আখ্যায়িত হয়। এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া মু'মিনের জন্য আবশ্যক নয়, ঈমান আনা আবশ্যক। যদি কোন বিরোধী আপত্তি করে আমরা তাদের বাঁধা দিতে পারি আর সে যদি বিরত না হয় তাহলে আমরা বলতে পারি, প্রথমে নিজেদের আনুসঙ্গিক সমস্যাদির সমাধান উপস্থাপন করুক" (তাদের যেসব সমস্যা রয়েছে প্রথমে সেগুলোর প্রমাণ দিক যে, তারা কীভাবে সেগুলোর সমাধান করেছে।) তিনি (আ.) বলেন, "বস্তুত নবুয়্যতের মোহর মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলীর মাঝে একটি নিদর্শন" (অর্থাৎ, তাঁর খাতামান নবীঈন হওয়া তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত।) "যার প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানের জন্য আবশ্যক।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৬-২৮৭, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অতএব, কেউ যদি খতমে নবুয়্যতে অবিশ্বাসী হয়, যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, তিনি (আ.) বলেন– এমন ব্যক্তি মুসলমানই নয়, সে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত।

এরপর খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্যাদা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "খতমে নবুয়্যতকে এভাবে বুঝতে পারি যে, যেখানে বা যে পর্যায়ে যুক্তিপ্রমাণ ও তত্ত্বজ্ঞানের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি ঘটে সে সীমানাকে খতমে নবুয়্যত নাম দেয়া হয়েছে। এরপর নাস্তিকদের মত ছিদ্রান্বেষণ করা অবিশ্বাসীদের কাজ। তিনি (আ.) বলেন, স্পষ্ট বিষয়াদি সব ক্ষেত্রেই থেকে থাকে। (তবে বিষয়াদী স্পষ্ট থাকলেও) এসব অনুধাবনের বিষয়টি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে। (মানুষের মাঝে যদি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞান থাকে আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি জ্যোতিও লাভ হয় তবেই এসব বিষয় বুঝা সম্ভব।) তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর আগমণের কল্যাণে ঈমান এবং তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করেছে। অন্যান্য জাতিও জ্যোতি লাভ করেছে, তবে অন্য কোন জাতি জ্যোতির্ময় ও সুস্পষ্ট শরীয়ত লাভ করে নি, যদি লাভ করতো তাহলে কি তারা আরবের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত না? (অন্যান্য জাতি পরিপূর্ণ শরীয়ত পায় নি। যেসব নবী এসেছেন তাঁরা স্ব স্ব অঞ্চলে এসেছেন। তিনি (আ.) বলেন, আরবরা যে খোদা সম্পর্কে বা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানত না এটিই এ কথার প্রমাণ। যারা জানত এবং যাদের যোগাযোগও ছিল তারাও মানে নি। কেননা, সেগুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত ও পূর্ণমাত্রার জ্যোতিসম্পন্ন ছিল না। পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে যদি পূর্ণাঙ্গীন আলো বা জ্যোতি থাকত তাহলে এর প্রভাব আরবদের ওপরও পড়ত।)

তিনি (আ.) বলেন, আরবদের মাঝে সেই সূর্য উদিত হয়েছে যা সকল জাতিকে আলোকিত করেছে, সকল জনপদকে স্বীয় আলোয় উদ্ভাসিত করেছে। (কিন্তু এটি কেবল হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এরই বিশেষত্ব, তিনি সেই সমুজ্জ্বল সূর্য যা সকল জাতিকে আলোকিত করেছে, সকল স্থানে, সকল দিগন্তে এবং সকল শহরে তাঁর আলো পৌঁছে গেছে। [তিনি (আ.) বলেন,) এই গর্ব কেবল কুরআনই করতে পারে যে, তৌহিদ এবং নবুয়্যতের বিষয়ে এটি পৃথিবীর সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত হতে সম্পূর্ণ সক্ষম। (একত্ববাদ এবং নবুয়্যত-সংক্রান্ত যে বিষয়াদি আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে বর্ণনা করেছেন তা এতটা যুক্তিপ্রমাণ সমৃদ্ধ যা পূর্বের কোন ধর্মকেই দেয়া হয়নি। অতএব, এই হলো শরীয়ত সম্পূর্ণ হওয়ার অর্থ আর মহানবী (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়া আখ্যায়িত হওয়ার মর্ম)] তিনি (আ.) বলেন, এটি গর্বের বিষয় যে, মুসলমানরা এমন গ্রন্থ লাভ করেছে। যারা আক্রমণ করে এবং ইসলামের নির্দেশনা ও শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে অভ্যন্তরীণভাবে তারা পুরোপুরি অন্ধ আর কথাও বলে ঈমানহীনতার ভিত্তিতে।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৩, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অতএব, ইসলামই আরব থেকে যাত্রা শুরু করে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে গেছে আর আজ পর্যন্ত স্বীয় সত্যিকার শিক্ষাসহ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পরিষ্কার করে এবং সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন আর বিভিন্ন জায়গায় এটি স্পষ্ট করেছেন, যে ব্যক্তি খতমে নবুয়্যত মানে না আমি তাকে বেদ্বীন এবং ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত মনে করি। সে আহমদীও নয় আর মুসলমানও নয়। অতএব আমাদের বিরুদ্ধে যে হইচই করা হয় আর এই মর্মে যে অপবাদ আমাদের প্রতি আরোপ করা হয় যে, আমরা খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী না এবং নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন হিসেবে মানি না, এটি নিতান্তই এক হীন এবং ঘৃণ্য অপবাদ।

বিশ্বের সকল প্রান্তে প্রসার লাভ করছে। আজ আহমদীয়া জামা'ত নিজেদের সমূহ শক্তি এবং উপায় ও উপকরণের মাধ্যমে একত্ববাদ ও নবুয়্যতের প্রকৃত মর্যাদাকে পৃথিবীর প্রতিটি শহর, গ্রাম এবং অলিগলিতে প্রচার করে চলেছে। অতএব, আমরাই খতমে নবুয়্যত এবং তাঁর (সা.) প্রতি অবতীর্ণ শরীয়তের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করি।

একমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মান ও যথাযোগ্য মর্যাদা সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকে পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছেন। মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি (আ.) শুধু অবহিতই করেন নি বরং এও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর শিক্ষা এতটাই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে যে, সেসব নবীর প্রকৃত মর্যাদা ও সত্যতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না যে, তারা সত্য ছিলেন কি-না! এটিও মহানবী (সা.)-এরই শ্রেষ্ঠত্ব যে তিনি পূর্ববর্তী নবীদের সত্যতা এবং তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, "সেই শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে, যা মানবীয় বৃত্তির পূর্ণ লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান করে আর শুধুমাত্র একপাক্ষিক প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান করে না। ইঞ্জিলের শিক্ষা দেখ! তা কী বলে আর মানবীয় শক্তিবৃত্তি-সংক্রান্ত কী শিক্ষা দেয়? মানবীয় শক্তিবৃত্তি এবং প্রকৃতি আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক গ্রন্থ (মানুষের প্রকৃতি ও শক্তিবৃত্তি আল্লাহ্‌র গ্রন্থের ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশ) তাই, তাঁর আক্ষরিক গ্রন্থ যাকে কিতাবুল্লাহ্ (কুরআন) বলা হয় অথবা একে ঐশী শিক্ষা বলতে পার তা 'সার্বিক রূপ ও গঠনের' বিপরীত ও বিরোধী কীভাবে হতে পারে? (আল্লাহ্ তা'লা স্বীয়উক্তি নির্ভর গ্রন্থে যে নির্দেশনা ও শিক্ষা অবতীর্ণ করেছেন, তা পবিত্র কুরআন আর একে কিতাবুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ বলা হয়। আর **'ফিতরতি তালীম'** বা প্রকৃতি সম্মত শিক্ষা যা সত্যিকার অর্থে মানবীয় বিভিন্ন অবস্থার নাম, তা এর বিপরীত হতে পারে না। কেননা তিনি (আ.) বলেছেন, মানব প্রকৃতি এবং মানুষের শক্তিবৃত্তির অবস্থা ও ক্ষমতা খোদা তা'লার ব্যবহারিক গ্রন্থ আর শরীয়ত হলো, তাঁর আক্ষরিক বা উক্তিভিত্তিক গ্রন্থ।)

তিনি (আ.) বলেন, একইভাবে মহানবী (সা.) যদি না আসতেন তাহলে পূর্বের নবীদের চারিত্রিক সৌন্দর্য, পথনির্দেশনা, নিদর্শনাবলী এবং পবিত্রকরণ শক্তি প্রশ্নবাণে জর্জরিত হত। কিন্তু মহানবী (সা.) এসে তাঁদের সবাইকে পবিত্র সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। (তিনি এসে সবার সত্যায়ন করেছেন) তাই তাঁর নবুয়্যতের নিদর্শনাবলী সূর্যের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল, দেদীপ্যমান আর অগণিত ও অপরিসীম। অতএব, তাঁর নবুয়্যত বা তাঁর নবুয়্যতের নিদর্শন নিয়ে আপত্তি করা এমনই বিষয় যেভাবে সমুজ্জ্বল দিন দেখেও কোন নির্বোধ অন্ধ বলে বসে, এখনো রাতই বিরাজমান। আমি পুনরায় বলছি, অন্যান্য ধর্ম অন্ধকারেই থেকে যেত যদি আজ পর্যন্ত মহানবী (সা.) না আসতেন। ঈমান ধ্বংস হয়ে যেত এবং পৃথিবী অভিশাপ ও ঐশী আযাবে ধ্বংস হয়ে যেত। ইসলাম প্রদীপের মত সমুজ্জ্বল যা অন্যদেরকেও অমানিশা থেকে মুক্ত করেছে। তওরাত পড়লে জান্নাত ও জাহান্নামের ধারণা পাওয়াই কঠিন হয়ে যায়। ইঞ্জিলকে দেখ! এতে একত্ববাদের চিহ্নই দেখা যায় না। এখন বল! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উভয় গ্রন্থই খোদার পক্ষ থেকে ছিল আর আছে কিন্তু এথেকে কোন্ আলো লাভ হয়? প্রকৃত আলো যা পরিত্রাণের জন্য আবশ্যক তা ইসলামেই রয়েছে। একত্ববাদকেই দেখ! কুরআনের যে জায়গাই খুলবে, একে নগ্ন তরবারির ন্যায় পরিদৃষ্ট হয় যা শিরকের মূল কর্তন করছে। অনুরূপভাবে, নবুয়্যতের প্রতিটি দিক এত পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সামনে আসে যে, এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট হওয়া সম্ভব নয়।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮২-২৮৩, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অতএব, এটি হলো খতমে নবুয়্যত-সংক্রান্ত সেই ব্যুৎপত্তি যা তিনি আমাদের দিয়েছেন। বর্তমান সময়ের আলেমরা অনায়াসে পরস্পরের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করছে, কিন্তু ভিন্ন ধর্মকে তাদের প্রকৃত চেহারা দেখিয়ে তাদের দুর্বলতা তাদের সামনে তুলে ধরে মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সাহস তাদের নেই। এ-কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবীয়ত ও সুশিক্ষার কল্যাণে আহমদীয়া জামা'তই করে যাচ্ছে, কিন্তু তাসত্ত্বেও এদের দৃষ্টিতে আমরা কাফির আর তারা মু'মিন!

স্বীয় দাবির স্বরূপ স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) তাঁর এক পুস্তকে বলেন, "এমনই দুর্ভাগা প্রতারক সে, যে স্বয়ং নবী এবং রসূল হওয়ার দাবি করে, সে কি কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী হতে পারে? আর এমন ব্যক্তি, যে কুরআনে বিশ্বাসী এবং এ আয়াত وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ -কে

আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলোকে নাউযুবিল্লাহ্ কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠই জ্ঞান করতাম তাহলে আমরা অর্থ ব্যয় করে এবং আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে বিশ্বব্যাপী কুরআনের অনুবাদ প্রচার করতাম না বরং এর পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলো প্রচার করতাম। এখন পর্যন্ত ৭৫টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের পুরো অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে আর আরো কয়েকটি ভাষায় অনুবাদকর্ম চলছে। ইনশাআল্লাহ্, অচিরেই তা প্রকাশিত হবে। ১১১টি ভাষায় কুরআনের নির্বাচিত আয়াতের অনুবাদ ছেপে প্রকাশিত হয়েছে।

বড় বড় ইসলামী রাষ্ট্র আর অঢেল সম্পদের মালিক ধর্মীয় সংগঠনগুলো বলুক তো, তারা কতগুলো ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ছেপে প্রচার করেছে?

আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, সে কি বলতে পারে মহানবী (সা.)-এর পর আমিও রসূল এবং নবী? ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির স্মরণ রাখা উচিত, এই অধম কখনো আর কোন সময় আক্ষরিক অর্থে স্বতন্ত্র নবী ও রসূল হওয়ার দাবি করে নি। রূপকভাবে কোন শব্দ ব্যবহার করা এবং অভিধানের সাধারণ অর্থের দিক থেকে আলাপ-আলোচনায় তা ব্যবহার করা আবশ্যকীয়ভাবে কুফর বা অস্বীকার করা নয় (অর্থাৎ, তাকে কাফির বানায় না।) কিন্তু আমি এটিও পছন্দ করি না। কেননা, এতে সাধারণ মুসলমানের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তথাপি সেই কথোপকথন ও বাক্যালাপ যা মহাসম্মানিত খোদার, আমার সাথে হয়েছে, যাতে নবুয়্যত ও রিসালত শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার কারণে সেগুলো আমি গোপন করতে পারি না। (আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন তাই আমি তা গোপন করতে পারি না।)

কিন্তু বার বার বলছি, সেসব ইলহামে 'মুরসাল', 'রসূল' এবং 'নবী'-সংক্রান্ত যে শব্দ আমার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা বস্তুত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অর্থে নয়। আর সত্যিকার মর্ম, সত্যের ভিত্তিতে আমি যার সাক্ষ্য দিচ্ছি তাহলো, আমাদের নবী (সা.) খাতামুল আম্বিয়া আর তাঁর পর কোন নবী আসবে না; পুরোনোও নয় আর নতুনও নয়। **'ওয়া মান কালা বা'দা রসূলেনা ওয়া সৈয়্যদেনা ইন্নি নাবিয়্যুন আও রাসূলুন আলা ওয়াজহিল হাকীকাতে ওয়াল ইফতেরায়ে ওয়া তারাকাল কুরআনা ওয়া আহকামাশ শরিয়্যাতিল গাররায়ে ফাহুয়া কাফেরুন কাজ্জাবুন।'** তিনি (আ.) বলেন, বস্তুত আমাদের ধর্ম হলো, যে ব্যক্তি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অর্থে নবী হওয়ার দাবি করে আর মহানবী (সা.)-এর কল্যাণরাজির আঁচলের সাথে স্বীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে আর এই পবিত্র প্রস্রবণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেই সরাসরি আল্লাহ্‌র নবী হতে চায় সে অবিশ্বাসী ও বেদ্বীন। খুব সম্ভব এমন ব্যক্তি নিজের জন্য নতুন কোন কলেমা আবিস্কার করবে আর ইবাদতে নতুন কোন পন্থা উদ্ভাবন করবে এবং শিক্ষাদীক্ষায় কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করবে। অতএব, এমন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুসায়লামা কাযযাবের ভাই আর তার কাফির হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ নাই। এমন নোংরা ব্যক্তি সম্পর্কে কীভাবে বলা যেতে পারে যে, সে পবিত্র কুরআন মানে ও বিশ্বাস রাখে।" (আনজামে আথম, রূহানী খাযায়েন, ১১তম খণ্ড, পৃ: ২৭-২৮, টীকা)

অতএব, মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে এবং তাঁর শরীয়তের অনুবর্তিতায় আল্লাহ্ তা'লা যাকে সম্মান দেন, সে-ই কেবল সম্মানিত হতে পারে, অন্য কেউ নয় আর তাঁর দাসত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে, নিজেকে কেউ মুসলমানও দাবি করতে পারে না।

পুনরায় অধিক স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব পবিত্র কুরআনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আর এ বিশ্বাসও রাখি যে, আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার নবী ও তাঁর রসূল আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম নিয়ে এসেছেন। আর এ কথায়ও বিশ্বাস রাখি যে, তিনি খাতামুল আম্বিয়া এবং তাঁর পর কোন নবী নেই। কিন্তু কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যার তরবীয়ত হয়েছে তাঁর (সা.) আধ্যাত্মিক কল্যাণ ধারার মাধ্যমে। [যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হয়েছে] এবং যার আবির্ভাব হয়েছে তাঁর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে। আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের ওলীদের স্বীয় কথোপকথন ও বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত করেন আর তাদেরকে নবীদের রঙে রঙিন করা হয় কিন্তু তারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী হন না। কেননা, পবিত্র কুরআন শরীয়তের সকল চাহিদা পূর্ণ করেছে। আর তাদেরকে কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি দান করা হয়, কিন্তু কুরআনে তারা কিছু সংযোজনও করে না আর বিয়োজনও নয়। যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে কোন কিছু সংযোজন করে বা বিন্দুমাত্রও বিয়োজন করে সে শয়তান এবং পাপাচারী।

আর আমরা খতমে নবুয়্যতের এ অর্থই করি যে, আমাদের সম্মানিত নবী (সা.) যিনি সকল নবী ও রসূলের মাঝে শ্রেষ্ঠ, তাঁর সত্তায় নবুয়্যতের সকল উৎকর্ষ পরম মার্গে উপনীত হয়েছে। আর আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, মহানবী (সা.)-এর পর নবুয়্যতের মর্যাদায় কেবল সেই ব্যক্তিই উন্নীত হতে পারে, যে তাঁর উম্মতভুক্ত হবে এবং তাঁর পূর্ণ অনুসারী বা অনুগামী হবে

আর সেসব কল্যাণ ও আশিস মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিকতা হতেই লাভ করবে এবং তাঁর আলোয় আলোকিত হবে। এ মর্যাদায় (মহানবী হতে) তার কোন ভিন্নতা নেই আর না এতে (মিথ্যা) আত্মাভিমান জেগে ওঠার মত কিছু আছে। এটি কোন পৃথক নবুয়্যত নয় আর বিস্ময়েরও বিষয় নয় বরং আহমদ মুজতবা (সা.)-ই অন্য আয়নায় প্রকাশিত হয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যার চেহারা আয়নায় দেখিয়েছেন, এমন কোন ব্যক্তি নিজের ছবি দেখে আত্মাভিমান বোধ করে না। কেননা, শিষ্য ও সন্তানদের বেলায় আত্মাভিমান কাজ করে না। অতএব, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে এবং তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে আসে, সে আসলে তিনি (সা.)-ই (তাঁরই পূর্ণাঙ্গীন প্রতিচ্ছবি)।

কেননা, সে পরিপূর্ণ আত্মবিলীনতার পর্যায়ে থাকে আর তাঁর রঙেই রঙিন থাকে এবং তাঁরই চাদরে আবৃত থাকে। আর মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সত্তা থেকেই সে নিজের অস্তিত্ব লাভ করে এবং তাঁরই কল্যাণরাজিতে তার সত্তা উৎকর্ষের পরম শিখরে উপনীত হয়। আর এটি সেই সত্য যা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এরই কল্যাণ বিতরণের সাক্ষ্য বহন করে। মানুষ মহানবী (সা.)-এর সৌন্দর্য এসব অনুসারীর পোশাকেই দেখে যারা তাদের পূর্ণ ভালোবাসা এবং স্বচ্ছতার কারণে তাঁর পবিত্র সত্তায় বিলীন হয়ে গেছে আর এর বিরুদ্ধে বিতণ্ডা করা এক প্রকার অজ্ঞতা। কেননা, তিনি যে 'আব্‌তার বা অপুত্রক' নন, এটি হলো খোদার পক্ষ থেকে তার প্রমাণ আর চিন্তাশীল মানুষের জন্য এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।

মহানবী (সা.) দৈহিকভাবে তো কোন পুরুষের পিতা নন কিন্তু স্বীয় রিসালাতের কল্যাণরাজির দিক থেকে তিনি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির পিতা, যে আধ্যাত্মিকতায় পরম উৎকর্ষ সাধন করে। তিনি (সা.) সকল নবীর খাতাম এবং সকল গৃহীত-জনের পথিকৃৎ। এখন খোদার দরবারে কেবল সে ব্যক্তিই পৌঁছতে পারে যার কাছে মহানবী (সা.)-এর মোহরের সত্যায়ন থাকবে এবং তাঁর সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী হবে। এখন কোন কর্ম বা ইবাদত তাঁর রিসালাত স্বীকার করা ছাড়া এবং তাঁর ধর্মের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে না। আর মহানবী (সা.) থেকে যে ব্যক্তি পৃথক হয়েছে এবং স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে তাঁর অনুসরণ করে নি সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁর পরে এখন আর কোন শরীয়ত আসতে পারে না এবং তাঁর কিতাব ও বিধিনিষেধকে এখন আর কেউ রহিত করতে পারে না। এছাড়া এখন তাঁর পবিত্র উক্তিতেও আর কেউ পরিবর্তন আনতে পারে না এবং কোন বৃষ্টিই এখন আর তাঁর মুষলধার বৃষ্টিসদৃশ হতে পারে না (অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক বৃষ্টি)। আর যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হয়েছে সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। আর মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যেসব বিষয় প্রমাণিত সেসব বিষয়ের অনুসরণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এখন আর আদৌ সফল হতে পারবে না।

আর মহানবী (সা.)-এর উপদেশাবলীর ছোট্ট একটি উপদেশও যে পরিত্যাগ করেছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এই উম্মতের নবী হওয়ার দাবি করে অথচ এ বিশ্বাস ধারণ করে না যে, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষায় সে শিক্ষিত এবং তাঁর উত্তমাদর্শ অনুসরণ ছাড়া সে নিতান্তই মূল্যহীন (তার কোন মূল্য নেই) আর পবিত্র কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত। (এ বিশ্বাস যে রাখে না) সে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে পাপাচারি ও কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবি করে আর এ বিশ্বাস পোষণ করে না যে, সে নিজে মহানবী (সা.)-এরই উম্মতভুক্ত এবং যা কিছুই সে পেয়েছে তা কেবল তাঁরই (সা.) কল্যাণে পেয়েছে আর সে তাঁরই বাগানের এক ফলমাত্র এবং তাঁরই মুষলধার বৃষ্টির এক বিন্দু আর তাঁরই জ্যোতির এক কিরণ, অন্যথায় সে অভিশপ্ত। তার প্রতি এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গ, অনুসারী ও সাহায্যকারীদের প্রতি খোদার অভিসম্পাত।

এখন কথা হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিশ্চয় নিজের ওপর বা তাঁর জামা'তের ওপর এই অভিশাপ বর্ষণ করেন নি? না, বরং এর তাৎপর্য হলো, তিনি (আ.) মনে করেন, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে তিনিই সবচেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করেছেন এবং তিনিই সেই মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন যেখানে পৌঁছার কল্যাণে এবং তাঁর (সা.) পূর্ণ অনুসরণের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে শরীয়ত বিহীন নবীর মর্যাদায় সমাসীন করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, "আকাশের নিচে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) ছাড়া আমাদের কোন নবী নেই আর কুরআন ব্যতীত আমাদের কোন গ্রন্থ নেই। আর যে-ই এর বিরোধিতা করেছে সে নিজেই নিজেকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।" (মওয়াহেবুর রহমান, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ২৮৫-২৮৭, আরবী থেকে উর্দূতে অনুদিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কৃত সূরা আহযাবের ৪১ নং আয়াতের তফসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৯৯-৭০১)

তিনি (আ.) অগণিত স্থানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্ম ও মর্যাদা এবং এর বিপরীতে নিজের মর্যাদা ও অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানরা যদি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকার অনুসারী হত তাহলে আমার আসার প্রয়োজনই বা কি ছিল?

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, ইহজাগতিক বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যে খতমে নবুয়্যতের দৃষ্টান্ত আমরা এভাবে দিতে পারি, যেভাবে চন্দ্রের সূচনা হয় 'হেলাল' বা 'নবীন চাঁদ'-এর মাধ্যমে আর চতুর্দশীতে যখন তা পূর্ণতা লাভ করে তাকে বলা হয় 'বদর'। অনুরূপভাবে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যত পরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে। যারা জোরপূর্বক এ বিশ্বাস করে যে, নবুয়্যত শেষ হয়ে গিয়েছে তারা তো ইউনুস বিন মাত্তার ওপরও মহানবী (সা.)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া উচিত নয় বলে মনে করে, এই সত্যকে তারা বুঝেই নি আর মহানবী (সা.)-এর কল্যাণরাজি, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের কোন জ্ঞানই তাদের নেই। এমন দুর্বল বোধশক্তি ও জ্ঞানের স্বল্পতা

বর্তমান সময়ের আলেমরা অনায়াসে পরস্পরের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করছে, কিন্তু ভিন্ন ধর্মকে তাদের প্রকৃত চেহারা দেখিয়ে তাদের দুর্বলতা তাদের সামনে তুলে ধরে মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সাহস তাদের নেই। এ-কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবীয়ত ও সুশিক্ষার কল্যাণে আহমদীয়া জামা'তই করে যাচ্ছে, কিন্তু তাসত্ত্বেও এদের দৃষ্টিতে আমরা কাফির আর তারা মু'মিন!

সত্ত্বেও আমাদেরকে বলে, আমরা 'খতমে নবুয়্যত' অস্বীকার করি। (নিজেরাই বুঝে নি অথচ আমাদেরকে বলে, আমরা খতমে নবুয়্যত অস্বীকার করি।) তিনি (আ.) বলেন, এমন রোগীদের আমি কী বলব! আর তাদের জন্য আক্ষেপই বা কী করব? তাদের অবস্থা যদি এমন না হত এবং ইসলামের প্রকৃত মর্ম ও তত্ত্ব থেকে যদি তারা পুরোপুরি দূরে সরেই না যেত (বর্তমানে মুসলমানদের যে অবস্থা তা যদি না হত, এমন অবস্থা যে, ইসলামের প্রকৃত অর্থই তারা বুঝে না আর ইসলাম থেকে তারা যদি দূরে সরে না যেত, (তিনি (আ.) বলেন,) তাহলে আমার আগমনের প্রয়োজন কী ছিল? (তাদের ঈমান যদি সঠিকই হত এবং আধ্যাত্মিকতা যদি নিখুঁত থাকত তাহলে আমার আসার প্রয়োজন ছিল কী?] এদের ঈমানী অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে গেছে এবং এরা ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ নতুবা সত্যের অনুসারীর প্রতি শত্রুতা পোষণের কোন কারণই ছিল না, যা মানুষকে কাফির বানিয়ে ছাড়ে। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২-৩৪৩, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অর্থাৎ, যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে প্রেরিত এবং মহানবী (সা.)-এর সত্তায় পূর্ণবিশ্বাসী, তার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীর শত্রুতা করার কোন কারণ নেই অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণের কোন কারণ ছিল না। কেননা, আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা পোষণ করা মানুষকে অবিশ্বাসী বানিয়ে দেয়। অতএব, মুসলমানরা আমাদেরকে যেহেতু কাফির আখ্যা দেয় তাই কলেমা পাঠকারী মুসলমানকে কাফির আখ্যাদাতাকে তা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। স্বয়ং মহানবী (সা.) বর্ণিত এ-সংক্রান্ত হাদীসও রয়েছে। (সূনান আবু দাউদ)

অতএব, আমাদেরকে যারা কাফির বলে তারা নিজেরাই এই অভিযোগে অভিযুক্ত। তাই সহানুভূতির প্রেরণা নিয়ে কলেমা পাঠকারী এসব লোককে একথাই বলব যে, নিজেদের প্রতি দয়া করুন এবং দেখুন ও বুঝুন! খোদা কী চান আর কী বলছেন?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম, হায়! ভদ্র প্রকৃতির মুসলমানদের জন্য এগুলো যদি হিদায়াতের কারণ হতো আর আমাদেরকে অভিযুক্ত করার পরিবর্তে নিজেদের অবস্থা যদি তারা বিশ্লেষণ করত! (তাহলে কত ভাল হতো)

পাকিস্তান সংসদে তারা আইনের ধারা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের মাঝে শব্দ চয়ন-সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত নেয়ার ছিল, এর কিছুদিন পূর্বে এক সাংসদ বিনা কারণে উত্তেজক একটি বক্তব্য রাখে। এটি সাংসদদের মাঝে শুধু মিথ্যা আত্মাভিমান জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই ছিল না বরং একই সাথে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির এক অপচেষ্টাও ছিল, যেন সবাই আহমদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। একই সাথে নিজেকে দেশের বিশ্বস্ত নেতা জাহির করাও উদ্দেশ্য ছিল এই আশায় যে, হয়ত এর ফলে তার রাজনৈতিক জীবন নতুনভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। কিন্তু সেখানকার কতক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ, প্রচারমাধ্যমের কুশলী এবং সমাজের সুশীল লোকেরা এটিকে অপছন্দ করেছেন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের আশায় বুক বাধা উচিত যে, পাকিস্তানে সুশীল সমাজের এমন লোকও রয়েছে যারা মন্দকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আরম্ভ করেছে। এসব লোক তার সামনেই তার আপত্তিরস্বরূপ কী, তাও স্পষ্ট করেছেন।

এই সাংসদ যিনি মহা সাফল্যের আত্মপ্রসাদ নিচ্ছেন, তিনি বলেন- কায়েদে আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের নাম ড. আব্দুস সালাম সাহেবের নামে নামকরণ করা হবে তা আমাদের আত্মাভিমান সইতে পারে না। কেননা, তিনি কাফির এবং খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী নয়।

তার একথা ভাবা উচিত ছিল, যে ব্যক্তি এ নাম রেখেছে তিনিও তোতার নিজ-দলেরই প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন আর কেবল তাই নয় বরং এই সাংসদের শ্বশুরও বটে। এই নাম যখন রাখা হচ্ছিল, তখন কেন সে আত্মাভিমান দেখায় নি আর সেসময় কেন এই আত্মাভিমান প্রদর্শন করে নি? এর কারণ শুধু এটিই যে, এই পার্টির বিরুদ্ধে হালে বিভিন্ন অভিযোগ উঠছে আর তারা মনে করছে, এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার এখন একটাই উপায় আর তাহলো, আহমদীদের বিরুদ্ধে মুখে যা আসে তাই বকতে থাক।

বাকি থাকল আহমদীদের বিষয়, নাম রাখুক বা না রাখুক, এতে আমাদের কিছুই যায়-আসে না বরং মরহুম ড. আব্দুস সালাম সাহেবের সবচেয়ে আপনজন অর্থাৎ তাঁর সন্তানসন্ততিরও (কিছু যায় আসে না)। যেদিন এ নাম রাখা হয়েছিল সেদিনই মরহুম ড. আব্দুস সালাম সাহেবের ছেলেরা এবং তার সন্তানসন্ততিরা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লিখেছিল, কিন্তু এর কোন উত্তর আসে নি। তারা লিখেছেন, ডক্টর সাহেবের মৃত্যুর ২০ বছর পর পাকিস্তান

পাকিস্তান সংসদে তারা আইনের ধারা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের মাঝে শব্দ চয়ন-সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত নেয়ার ছিল, এর কিছুদিন পূর্বে এক সাংসদ বিনা কারণে উত্তেজক একটি বক্তব্য রাখে। এটি সাংসদদের মাঝে শুধু মিথ্যা আত্মাভিমান জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই ছিল না বরং একই সাথে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির এক অপচেষ্টাও ছিল, যেন সবাই আহমদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। একই সাথে নিজেকে দেশের বিশ্বস্ত নেতা জাহির করাও উদ্দেশ্য ছিল এই আশায় যে, হয়ত এর ফলে তার রাজনৈতিক জীবন নতুনভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

সরকারের মাথায় এলো যে, পাকিস্তানের এই খ্যাতিমান বিজ্ঞানীর নামে (বিশ্ববিদ্যালয়ের) কোন বিভাগের নাম রাখা উচিত, এটি ভেবে আমরা বিস্মিত। তার সন্তানরা এটিও লিখেছেন যে, পাকিস্তানের আইন আমার পিতাকে অমুসলমান আখ্যা দিয়েছিল এবং এর জন্য তিনি মর্মাহতও ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তানের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন নি। বরং যুক্তরাজ্য, ইতালি এমনকি ভারতের পক্ষ থেকেও তাকে নাগরিকত্ব প্রদানের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, কিন্তু সর্বদাই তিনি বলতেন, আমি সব সময় পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম আর ভবিষ্যতেও থাকব এবং পাকিস্তানের কল্যাণের জন্য আজীবন চেষ্টা করে যাব আর তিনি তা করেও গেছেন। সারকথা হলো, ড. আব্দুস সালাম সাহেবের সন্তানসন্ততিরা পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলেন, আমরা মুসলমান আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি। তাই আমরা ড. সালাম সাহেবের পরিবারের সদস্য ও সন্তানসন্ততি হিসেবে লিখছি, পাকিস্তানে যেহেতু আমাদের অধিকার প্রদান করা হয় না এবং আমরা যা বিশ্বাস করি আমাদেরকে তা মনে করা হয় না, তাই সরকারের এমন সিদ্ধান্তে আমরা সন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে এর সাথে আমাদের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা না থাকার ঘোষণা দিচ্ছি বরং এর সাথে আমাদের অসম্পৃক্ত থাকার ঘোষণা দিচ্ছি। এই ছিল ড. সালাম সাহেবের সন্তানসন্ততির প্রতিক্রিয়া।

পাকিস্তানের সংসদ এ নাম পরিবর্তন করতে চাইলে সানন্দে করুক, এতে 'সালাম পরিবার' এবং আহমদীয়া জামা'তের কিছুই যায় আসে না।

এরা আরো বলে, আহমদীদেরকে সেনাবাহিনীতে নেয়া উচিত নয়। অথচ পাকিস্তানের ইতিহাস একথাই বলছে, আজ পর্যন্ত যত আহমদী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন, দেশের জন্য তারা অবলীলায় সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দেশের জন্য সচরাচর সিপাহী বা জুনিয়র কমিশন অফিসার অথবা সর্বোচ্চ কর্ণেল মেজররাই আত্মত্যাগ স্বীকার করে। কিন্তু আহমদী সদস্যরা এমন, যারা জেনারেলের পদবীতে থাকা সত্ত্বেও সম্মুখ সমরে অংশ নিয়েছেন এবং শহীদও হয়েছেন। পাকিস্তানের প্রচারমাধ্যমও আজকাল এবিষয়ে আলোচনা করছে আর প্রকৃত সত্য সামনে আনছে আর তারা এদের বলছেও যে, তোমরা এসব কী বলছ? তারা তাদের আলোচনায় জেনারেল আখতার ও জেনারেল আলীর নাম উল্লেখ করছেন। প্রচারমাধ্যমে জেনারেল ইফতেখারের নাম এসেছে, যিনি শহীদ হয়েছেন। অথচ এই সাংসদ, যিনি খুবই জোরালো বক্তব্য রেখেছেন তিনি নিজেই সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন পর্যন্ত পৌঁছার পর প্রধানমন্ত্রীর জামাতা হওয়ার সুবাদে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন এবং অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন আর রাজনীতিতে যোগ দেন। দেশপ্রেমের চেতনাই যদি থাকত তবে তার সেনাবাহিনীতেই থাকার কথা ছিল আর দেশের খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করা উচিত ছিল।

অনুরূপভাবে, আহমদীদের ওপর এ অপবাদও আরোপ করা হয় যে, এরা জাতির সেবা করে না, জাতির প্রতি বিশ্বস্ত নয়। কিন্তু পূর্ণ আস্থার সাথে আমি বলতে পারি যে, 'স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ'– এ হাদীসের ওপর পাকিস্তানে আজ আহমদীরাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে, এর ওপর আমল করে এবং নিজেদের জান ও মাল উৎসর্গ করে আর করে চলছেও। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আমরা বক্তৃতা করি না, আর রাজনীতির সাথে আমাদের কোন সম্পৃক্ততাও নেই। ধর্মের খাতিরে আমরা প্রাণ বিসর্জন দেই ঠিকই কিন্তু ধর্মের নামে রাজনীতি এবং মানুষ হত্যা করি না। আমরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি এবং আন্তরিকভাবে মানি আর তাঁর সম্মানের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করি আর তা করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকি। আমরা এ কুরবানী দিচ্ছি আর ভবিষ্যতেও দিতে থাকব, ইনশাআল্লাহ্। এই দেশ, যার জন্য আহমদীরা মহান ত্যাগ স্বীকার করেছে, আর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে, প্রত্যেক পাকিস্তানী আহমদীর জন্য আবশ্যক– তারা যেন দোয়া করে যে, আল্লাহ্ তা'লা এই দেশকে সদা নিরাপদ রাখুন এবং অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী নেতা আর স্বার্থপর আলেমদের হাত থেকে একে রক্ষা করুন এবং পাকিস্তানও পৃথিবীর স্বাধীন ও সম্মানিত দেশগুলোর মাঝে গণ্য হতে আরম্ভ করুক।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ থেকে ৯ নভেম্বর, ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৪৪, পৃ: ৫-৯)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৪র্থ কিস্তি)

(১৬) নং প্রশ্নঃ ইঞ্জিলে লিখা আছে যে, মসীহ্ (আ.) মহিমা ও প্রতাপের সাথে পৃথিবীতে আসবেন এবং পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করবে। কিন্তু এ স্থলে মহিমার সাথে আসার কোনো চিহ্ন ও নাম-নিশানা নেই এবং পৃথিবীও (আপনাকে) গ্রহণ করে নি।?

উত্তরঃ মথি লিখিত ইঞ্জিলের ২৫তম অধ্যায়ে ৩১-৪৬ সূত্রগুলোতে এ রকম বর্ণনা রয়েছে: 'ইবনে-আদম (তথা মনুস্য-পুত্র মসীহ্) পবিত্র ফিরিশ্‌তাদের সঙ্গে নিয়ে নিজের মহিমায় আসবেন'– এটি প্রকৃতপক্ষে এ পৃথিবীর সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং এ রকম আগমন এ দুনিয়ার ধারাবাহিকতার অবসানের পরে হবে। এটি 'হাশর' বা পুনরুত্থানের পর সংঘটিত হবে, যখন পবিত্র সমস্ত নবী নিজের নিজের মহিমায় আবির্ভূত হবেন এবং নিজের নিজের উম্মতের সত্যপরায়ণদের সুসংবাদ দেবেন এবং তাঁদের নির্দেশনা অমান্যকারীদের অভিযুক্ত করবেন।'

কিন্তু উল্লিখিত ইঞ্জিলের চৌত্রিশতম সূত্রে হযরত মসীহ্ অমায়িক অবস্থায়ও তাঁর আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, "হে আমার পিতার আশিসমন্ডিত লোকেরা! দুনিয়ার শুরু থেকে যে 'রাজত্ব' তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তার উত্তরাধিকারী হও। কেননা, যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে। যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন পানি দিয়েছিলে, যখন মেহমান হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে, যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে, যখন অসুস্থ ছিলাম তখন আমার দেখা-শোনা করেছিলে। আর যখন আমি জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।" তখন আল্লাহ্‌ভক্ত সত্যপরায়ণ লোকেরা জবাবে তাঁকে বলবে, 'প্রভু! আপনার খিদে পেয়েছে দেখে কখন আপনাকে খেতে দিয়েছিলাম বা পিপাসা পেয়েছে দেখে পানি দিয়েছিলাম? আর কখনইবা আপনাকে অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে আপনার কাছে গিয়েছিলাম?' এর জবাবে বাদশাহ্ তখন তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই ছোট ভাইদের মধ্যে সবচে' সামান্য কোনো একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।' পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন, 'হে অভিশাপগ্রস্ত লোকেরা! আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। ইবলিস (শয়তান) এবং তার ফেরেশ্‌তাদের (তথা তার ভক্ত অনুসারীদের) জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দাও নি। যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন পানি দাও নি। যখন মেহ্‌মান হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দাও নি, যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন আমাকে কাপড় পরাও নি, যখন অসুস্থ হয়েছিলাম এবং জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে যাও নি।' তখন তারা তাঁকে বলবে, 'প্রভু! কখন আপনার খিদে বা পিপাসা পেয়েছে দেখে কিংবা মেহ্‌মান হয়েছেন দেখে, কিংবা খালি গায়ে দেখে, কিংবা অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে আপনার সেবা ও সাহায্য করি নি?' জবাবে তিনি তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যখন আমার এই **ছোট ভাইদের মধ্যে** কোনো একজনের জন্য তা কর নি তখন তা আমার জন্যই কর নি। তাই এ লোকগুলো চিরকালের শাস্তি ভোগ করতে যাবে। কিন্তু সত্যপরায়ণগণ চিরকালের জীবন পাবে।"

এখন গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত, ইঞ্জিলের সমস্ত এই সূত্রগুলো থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মসীহ্ (আ.) তাঁর কতিপয় সদৃশের কথা উল্লেখ করে দুনিয়ায় তাঁদের আগমন ও কষ্ট স্বীকারের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ছোট ভাইগণ বলতে উল্লিখিত ওই সকল লোক ছাড়া অন্য কোন্ লোকদের বোঝানো হয়ে থাকতে পারে?– যারা মসীহ্‌র কিছুটা পদমর্যাদা ও তাঁর স্বভাব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের অংশীদার হবেন এবং তাঁর নামে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আসবেন। খ্রিষ্টানরা তো বলতে পারেন না যে, তারা হযরত

[বাকি অংশ ২৫নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২২/১২/১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ ভুঁইয়া। উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম ফজল মাহমুদ, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব তৌফিক আহমদ। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতি পাঠ করেন মৌলানা তাহের আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দোয়া কবুলিয়তের ওপর বক্তব্য রাখেন মৌলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন মুরব্বী সিলসিলা।

এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মৌলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন সাহেব মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সমাপ্তি দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম ইমতিয়াজ আলী, সেক্রেটারী তবলীগ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে ১৫ জন মেহমানসহ মোট ১৫৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফজল মাহমুদ
আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত,
নারায়ণগঞ্জ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তাহেরাবাদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৮/০১/২০১৮ইং তারিখে বাদ আসর মসজিদ প্রাঙ্গণে তাহেরাবাদ জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। স্থানীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল হোসেন মন্ডল সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান। নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন। বক্তৃতা করেন পর্যায়ক্রমে মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, জিনাত আলী, ফরহাদ হোসেন, আব্দুল খালেক মোল্লাহ। সব শেষে সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ৪৮ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তাহেরাবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তাহেরাবাদে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২০/০২/২০১৮ইং তারিখে বাদ আসর মসজিদ প্রাঙ্গণে তাহেরাবাদ জামাতে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইউনুস আলী সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ করা হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ মাহেনুর রহমান। বক্তৃতা করেন পর্যায়ক্রমে মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, জিন্নাত আলী, ফরহাদ হোসেন, আব্দুল খালেক মোল্লাহ। সব শেষে সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া করে সভা সমাপ্তি করেন। ৪৫ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তাহেরাবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রংপুরে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২০/০২/২০১৮ তারিখ রোজ মঙ্গলবার মুন্সিপাড়াস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রংপুরের মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব খন্দকার মাহবুব-উল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রংপুর। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নাজিফ আহমদ নাজিফ। নযম পাঠ করেন জনাব আমিরুল ইসলাম ও মহমুদ আহমদ নিবিড়। মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবসের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর শিক্ষার আলোকে আমাদের করণীয় প্রভৃতি বিষয়ের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে সর্বজনাব আহমদ তাহমিদুজ্জামান রাফিদ, মাহমুদ আহমদ নিবিড়, কায়েদ, রংপুর মজলিস, মসীহাজ্জামান শাহীন, আমিরুল ইসলাম, আব্দুর রশিদ, আফজাল হোসেন ও মৌলবী সেলিম আহমদ কাজল, মোয়াল্লেম। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। এতে প্রায় ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদ আহমদ নিবিড়

বা-জামাত নামাযের গুরুত্বের উপর আলোচনা সভা ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকার উদ্যোগে সাধারণ সভা ও বা- জামাত নামাযের গুরুত্বের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। সভা পরিচালনা করেন জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ, যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, মোন্তাযেম সহকারী তবলীগ, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা। মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের দেয়া কর্ম-ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বিগত মাসের কার্যক্রম ও চলতি মাসের কর্মসূচী নিয়ে আলোকপাত করেন জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ, যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা। নামায কায়েম করার উপর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন জনাব মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, মুরুব্বী সিলসিলাহ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

পরিশেষে, আমীর সাহেব নসিহতমূলক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করে দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ করেন। সভায় মোট উপস্থিত ছিলেন ৮৫ জন।

শফিকুল হাকিম আহমদ

মজলিস আনাসারুল্লাহ্, মিরপুর-এর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২০শে জানুয়ারি ২০১৮ শনিবার বাদ আসর থেকে এশা পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ্ মিরপুর এর কর্মশালা মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। নবনিযুক্ত আমেলার সদস্যদের ও হালকা যয়ীমগণ এবং সায়েকগণের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জন্য এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় কেন্দ্র থেকে উপস্থিত ছিলেন নায়েব সদর সফে দওম আবু নঈম আল মাহমুদ, নায়েব সদর হালিম আহমদ হাজারী ও ঢাকা বিভাগীয় রিজিওনাল নাযেম আলা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেব। নায়েব সদর ও মিরপুর জামাতের সম্মানিত আমীর মোকাররম মোহাম্মদ গোলাম কাদের সাহেবের সভাপতিত্বে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার পর কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মজলিসের যয়ীম আলা জনাব আবু জাকির আহমদ। তিনি আমেলার সদস্যদের পরিচিতি ও মজলিসের সার্বিক কর্মকান্ড সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন। কর্মশালায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও বার্ষিক কর্মসূচির আলোকে বিভাগ ভিত্তিক কাজের বিবরণীর হ্যান্ডনোট অংশগ্রহণকরীদেরকে বিতরণ করা হয়। কর্মশালায় আমেলার অধিকাংশ সদস্য ও হালকা যয়ীমগণ এবং তাদের সায়েকগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় মোন্তাযেমগণের বিভাগীয় কর্মকান্ড ও রিপোর্ট প্রদান পদ্ধতি এবং কিভাবে বিভিন্ন প্রোগ্রাম সফলভাবে করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সদস্যদের সার্বিক তরবীয়তির মান উন্নয়নের ও শুরার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে কর্মকর্তাদের আদর্শ স্থাপন ও মজলিসের সকল সদস্যের সাথে ব্যাক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়। সবশেষে সভাপতির বক্তব্য ও আহাদনামা পাঠের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি হয়। সভা শেষে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ভূইয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, হেলেঞ্চাকুড়িতে ওয়কারে আমল অনুষ্ঠিত

গত ১৬/০২/২০১৮ তারিখে বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হেলেঞ্চাকুড়িতে এক বিশেষ ওয়াকারে আমল করা হয়। উক্ত ওয়াকারে আমলের মাধ্যমে নাপিত পাড়া চৌরাস্তা মোড় হতে মসজিদ পর্যন্ত প্রায় ১/৪ কি.মি. রাস্তা সংস্কার করা হয়। উক্ত ওয়াকারে আমলে আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল মিলে মোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আতিকুর রহমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে "বিবাহ ও জীবন" বই-এর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৯/০১/২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে 'বিবাহ ও জীবন' বই থেকে সেমিনার ও পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন সাবিহা সুপ্তা। আহাদনামা পাঠ করেন লাকী আহমদ, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়া। দোয়া পরিচালনা করেন লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়া এবং লাজনাদের বিবাহ জীবন বই থেকে পড়ে শুনান প্রেসিডেন্ট সাহেবা। বই থেকে লাজনাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করা হয়। কুইজ এর উত্তর দেন ৭ জন লাজনা বোন। উক্ত সেমিনারে ২৩ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

লাকী আহমদ

বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক সালানা জলসা-২০১৮ সফলভাবে অনুষ্ঠিত

সৈয়দপুরের ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক সালানা জলসা ২০১৮-এর কিছু খণ্ডচিত্র

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুর তাহের আবাসিক এলাকায় ২৩-০২-২০১৮ ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার জুমুআর নামায ও তারপর মোহতরম আলহাজ্ব মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তিলাওয়াত, নযম এরপর আমীর সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার অধিবেশন শুরু হয়।

২৪/০২/২০১৮ তারিখ শনিবার সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে ১২.৪৫ মিনিট পর্যন্ত মোহতরম খলীলুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এবং ২৪/০২/২০১৮ তারিখ বিকাল ২.৪৫ মিনিট থেকে ৬.০০ পর্যন্ত মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে ও আমীর সাহেবের সমাপনী ভাষন ও দোয়ার মাধ্যমে ২দিন ব্যাপি জলসা সফলতার সাথে সমাপ্তি হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

এছাড়াও জলসার দুই দিনই সন্ধ্যার পর জেরে তবলীগ মেহমানদের নিয়ে তবলীগি প্রশ্নোত্তোর অনুষ্ঠান হয় এবং ১৬ জন বয়আত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

আমরা বিগত ৫টি জলসা মাহিগঞ্জে আমাদের নিজস্ব গন্ডির ভিতর মসজিদ প্রাঙ্গনে জলসা করেছি। সেখানে পূর্ব হতেই কিছু অবকাঠামো তৈরী ছিল। কিন্তু এবারই প্রথম কেন্দ্রের নির্দেশে জামাতের ক্রয়কৃত জায়গায় প্রথমবারের মতো খোলা মাঠে জলসার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া মাত্র ৩/৪দিন সময় পেয়েছি। তাই সবদিক থেকে এবারের জলসা আমাদের জন্য বড় ধরণের পরীক্ষা ছিল।

এ জলসাকে সফল করার জন্য কর্মীগণ রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

মহান আল্লাহর অশেষ ফজলে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুর তাহের আবাসিক এলাকায় ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত করার তৌফিক দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

এ মহতী জলসায় মহিলা ও পুরষ মিলে প্রায় ১২০০ জন উপস্থিত ছিল এবং ১৬ জন বয়আত গ্রহণ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

পরিশেষে বন্ধুদের কাছে বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন ভবিষ্যতে যেন আমরা সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে আরো সুন্দরভাবে জলসা করতে পারি। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলের সহায় হোন এবং এই মহতী জলসার কল্যানে ভূষিত করুন আমিন।

শেখ শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সন্তান লাভ

আমি তানজিম আহমদ হাজারী, পিতা: রহিম আহমদ হাজারী, জামা'ত ঘাটুরা। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি, রোজ মঙ্গলবার ভোর ৬.২২ মিনিটে আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় একজন পুত্র সন্তানের জনক হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ্। তার নাম ইহরাম তাফিয়াদ হাজারী। আমার সন্তানের উজ্জল ভবিষ্যৎ এবং সে যাতে বড় হয়ে জামাতের একজন আদর্শবান এবং নিষ্ঠাবান কর্মী হয়ে উঠতে পারে সেজন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়ার আরজি জানাচ্ছি।

নিবেদক
তানজিম আহমদ হাজারী, ঘাটুরা জামা'ত

[২০ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ]

মসীহ্‌র ভাই। বস্তুত 'মুহাদ্দাস' (তথা বহুল ওহী-ইলহাম বা ঐশীবাণীপ্রাপ্ত ব্যক্তি) নিঃসন্দেহে নবীর ছোট ভাই বিশেষ হয়ে থাকেন এবং (পবিত্র হাদীসে) সকল নবী পরস্পর 'বৈমাত্রেয় ভাই' স্বরূপ বলে অভিহিত। আর এটি এ বিষয়ের দিকে অতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিত যে, তাদের (তথা উল্লিখিত কতিপয় মসীহ্-সদৃশ ব্যক্তির) আগমনকে হযরত মসীহ্ তাঁর নিজের আগমন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

আর এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এ অধমের এই আগমন তুলনামূলকভাবে প্রতাপ ও মহিমাযুক্ত আগমনও বটে। কেননা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তৌহীদ বা একত্ববাদের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এটি (তথা এই আগমন) বড় বড় সাফল্যের পটভূমি স্বরূপ বটে। আর মহিমা ও প্রতাপযুক্ত আগমন দ্বারা যদি জাগতিক ও রাষ্ট্রীয় দাপটের ধারায় আগমন বোঝায় বলে ধরা হয়, তাহলে এটা সঠিক নয়। এটা একবারে ন্যায় বিচার বহির্ভূত বিষয় যে, কোনো ব্যক্তি গাফিলদের জাগাবার উদ্দেশ্যে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আসবেন আর এসে তিনি মার-ধর এবং হত্যাযজ্ঞ ও রক্তপাতের মাধ্যমে কার্য সিদ্ধি করতে প্রয়াস পাবেন! বস্তুত 'হুজ্জত' তথা যুক্তি-প্রমাণের পরিপূর্ণতা সাধিত না হওয়া পর্যন্ত খোদা তা'লা কোনো জাতির ওপর আযাব অবতীর্ণ করেন না। মোদ্দাকথা, হযরত মসীহ্‌র প্রতাপ ও মহিমাযুক্ত আগমন যে অর্থে খ্রিষ্টানরা বর্ণনা করেন সেটি দুনিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এ জগতে যে মসীহ্‌র আসার প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেটির এহেন জালালী (বা প্রতাপপূর্ণ) পদ্ধতিতে আগমনের সাথে আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। খ্রিষ্টানরা বিষয়টিতে কোথাকার পানি কোথায় গড়িয়েছেন!? এর ফলশ্রুতিতে তারা বিষয়টির প্রকৃত সত্যতাকে নিজেদের জন্য সন্দেহবিদ্ধ করে ফেলেছেন। সুতরাং মথি লিখিত ইঞ্জিলের উল্লিখিত শ্লোকগুলো স্পষ্টত ব্যক্ত করছে যে, মসীহ্‌র এই জালালী (প্রতাপপূর্ণ) আগমন বস্তুতপক্ষে তখনই হবে যখন 'হাশর' বা পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার পর প্রত্যেক মানুষের শেষ বিচারে হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হবে। হাশর বা পুনরুত্থান ছাড়া পরলোকগত দুষ্কৃতিপরায়ণ ও সত্যপরায়ণদের দল ও জামা'তসমূহ কী করে পরিপূর্ণভাবে (শেষ বিচারের জন্য) এক জায়গায় একত্রিত হতে পারে? কিন্তু মথির ইঞ্জিলের ২৫তম অধ্যায়ের উল্লিখিত শ্লোকগুলো থেকে প্রতীয়মান বিষয়বস্তুর বিপরীতে মথির চব্বিশতম অধ্যায় থেকে এ জগতেই মসীহ্‌র আগমনও প্রতীয়মান হয়। এ উভয় প্রকার বর্ণনাগুলোর মাঝে সমন্বয় এভাবেই হতে পারে যে, পরকালে অনুষ্ঠিতব্য হাশর বা পুনরুত্থানের পর যিনি আসবেন তিনি হবেন স্বয়ং মসীহ্। কিন্তু দুনিয়ায় মসীহ্‌র নামে যিনি আসবেন তিনি হলেন আগমনকারী 'মসীহ্-সদৃশ' যিনি হযরত মসীহ্‌র 'ছোট ভাই' এবং তাঁরই কথা বা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর (আধ্যাত্মিক) অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়ায় ফিরে আসার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ নিজের সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'পুনরায় আমাকে তোমরা আর দেখবে না।' অতএব, তিনি কী ক'রে দুনিয়ায় আসতে পারেন? ইঞ্জিলে স্বয়ং তিনি নিজে বলে গেছেন, 'পুনরায় আমাকে আর দেখতে পাবে না'!

এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, দুনিয়া কর্তৃক গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত হওয়া আবশ্যিক নয়। দুনিয়া সর্বদাই ধীরে ধীরে গ্রহণ করে থাকে। দুনিয়াতে ওই সব লোকের উপস্থিতিও তো আবশ্যক যারা ঈমান আনবে না, কিন্তু 'মসীহ্‌র নিঃশ্বাস-প্রবাহে তারা মারা যাবে'। পবিত্র হাদীস অনুযায়ী 'নিঃশ্বাস প্রবাহে মারা যাবে' বলতে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তাদের মৃত সাব্যস্ত হওয়া বোঝায়। ইঞ্জিলসমূহেও লেখা আছে যে, 'মসীহ্‌র অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালে কিছু লোক পাকড়াও হবে আর কিছু লোক ছাড়া পাবে' অর্থাৎ কিছু লোকের ওপর আযাব আসার উদ্দেশ্যে 'হুজ্জত' (তথা অকাট্য যুক্তি) প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে করে অন্য কথায়, তারা যেন বস্তুতই ধরা পড়লো। আর কিছু লোক পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে উপযুক্ততার অধিকারী হবে। অন্য কথায়, তারা যেন পরিত্রাণ লাভ করলো।

(১৭) নং প্রশ্ন: এখন 'মসীহ্ সদৃশ' ব্যক্তির আসার কী প্রয়োজন ছিল?

উত্তর: এখন 'মসীহ্-সদৃশ' মহাপুরুষের আগমন অতীব আবশ্যক ছিল। সেই সাথে জীবিত করার উদ্দেশ্যে যে সকল ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়ে থাকে তাদের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, কেননা আধ্যাত্মিক মৃত্যু ও গাফিলতি এক জগতজুড়ে ছেয়ে পড়েছে, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর প্রতি ভালবাসা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। হৃদয়ের কাঠিন্য ও পার্থিবতার উপাসনা প্রবল হয়ে পড়েছে এবং যে-সব কারণে তৌরাতের সাহায্যার্থে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম প্রেরিত হয়েছিলেন সে-যাবতীয় কারণের উদ্ভব ঘটেছে। আর দাজ্জালও অত্যন্ত জোরেশোরে তার বহির্প্রকাশ ঘটিয়েছে এবং হযরত আদমের জন্ম লাভের হিসাবে ষষ্ঠ সহস্রাব্দের শেষাংশও সমোপস্থিত, যা **'ইন্না ইয়াওমান ইন্দা রাব্বিকা কা-আল্‌ফি সানাতিম্ মিম্মা তাউদ্দূন'** (সূরা আল-হাজ্জ: ৪৮) আয়াত অনুযায়ী ষষ্ঠ দিবসের স্থলাভিষিক্ত। অতএব এই ষষ্ঠ দিবসে সেই আদমের জন্ম হওয়া আবশ্যকীয় ছিল– যিনি তাঁর আধ্যাত্মিক জন্মের দিক দিয়ে হযরত মসীহ্‌র সদৃশ। এ কারণে খোদা তা'লা এ অধমকে 'মসীহ্-সদৃশ', আর সেই সাথে ষষ্ঠ সহস্রাব্দীর আদম হিসেবে পাঠিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেন– যা বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে: **'আরাদ্‌তু আন্ আস্তাখলিফা ফাখালক্বতু আদামা'** অর্থাৎ 'আমি আমার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) সৃষ্টি করতে চেয়েছি, অতএব আমি আদমকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর অন্যত্র তিনি বলেন: **'খালাকা আদামা ফা-আকরামাহু'–** অর্থাৎ 'আদমকে সৃষ্টি করি। এরপর তাকে সম্মানে ভূষিত করি।' আর যেমন আদমকে ঘৃণার ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং ফাসাদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়, তেমনি একই রূপ এ স্থলেও ধারণ করে। আর যেহেতু আদম এবং মসীহ্‌র মাঝে পারস্পরিক সাদৃশ্য রয়েছে, তাই এ অধমকে আদম ও মসীহ্ উভয় নামে অভিহিত করা হয়।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(২৫তম কিস্তি)

দান ও অনুগ্রহ করার জন্য মানবীয় প্রতিদান নেই

ইসলামের মতে শিষ্টাচার এমন কোনও ভাসাভাসা অভ্যাস নয় যা সভ্যতার মূল্যবোধ থেকে আহৃত, বরং তার মূল গভীরভাবে প্রোথিত আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের মধ্যে। গরীব মিকীনদেকে যা কিছু দান করা হয়, তা যেন এই উদ্দেশ্যে করা না হয় যে, তার বিনিময়ে অবশেষে দান গ্রহীতার কাছ থেকে কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে।

"এবং তুমি এইজন্য দান করো না যেন (বিনিময়ে) অধিক পাও।" (আল্ মুদ্‌দাসের, ৭৪:৭)

একবার কাউকে কোন কৃপা করা হলে, ইসলাম চায় যে, কৃপাকারী যেন তা এমনভাবে ভুলে যায় যে, যেন কিছুই ঘটেনি। কারও পক্ষে তার কোন সৎকাজের জন্য উল্লাস প্রকাশ করাকে এবং কারো প্রতি কৃপা প্রদর্শনের জন্য খোঁটা দেওয়াকেসেই সৎকর্মের পক্ষে আত্মঘাতী এবং আত্ম-উৎখাতকারী বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্ত আগয়াতগুলিতে। এই সকল আয়াতে সঠিক ও বেঠিক ব্যবহারের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে বিশদভাবে:

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্যবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায় যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ'টি করে শস্যদানা থাকে। এবং আল্লাহ্ যার জন্য চান (আরও বেশী) বৃদ্ধি করে দেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী। যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, অতঃপর, তারা যে খরচ করে তার সম্বন্ধে পিছনে খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে বেড়ায় না; তাদের জন্য তাদের প্রভুর সান্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই, এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ন্যায়সঙ্গত কথা এবং ক্ষমা সেই দান থেকে উত্তম যার পরে কষ্ট-ক্লেশ আরম্ভ হয়ে যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যশালী, পরম সহিষ্ণু । হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দানের খোঁটা না দিয়ে নিজেদের দানসমূহকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করে দিও না, তার উপমা সেই মসৃণ-শক্তি পাথরের অবস্থার ন্যায় যার ওপরে সামান্য মাটি পড়ে থাকে, অতঃপর, তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং সেটাকে পরিষ্কার কঠিন প্রস্তরূপেই রেখে যায়। তারা যা কিছু উপার্জন করে তার কোন অংশই তারা রক্ষা করতে পারে না। বস্তুতঃ, অবিশ্বাসী জাতিকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেন না।" (আল্ বাকারা, ২:২৬২-২৬৫)

একই ভাবে:

ভিক্ষাবৃত্তি

এমনকি, ভিক্ষুকদের প্রতিও শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করতে হবে। কোন ভিক্ষুকের সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলবে না। যতিও, ভিক্ষাবৃত্তিকে অপসন্দ করা হয়েছে, তবু নিতান্ত প্রয়োজনে ভিক্ষার অনুমতিও নিশ্চিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যারা বাধ্য হয়ে ভিক্ষা করে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত করতেও কাউকে অনুমতি দেওয়া হয় নি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে, ভিক্ষুকের আত্মসম্মান সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও, সমাজ সামগ্রিকভাবে এটা উপলব্ধি করতো যে, ভিক্ষা করার চাইতে ভিক্ষা না করাই নিঃসন্দেহে উত্তম। এই বিষয়টাকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধারার জন্য হযরত রসূলে পাক (সা.) বলেছেন:

ইসলামের প্রাথমিক যুগে, ভিক্ষুকের আত্মসম্মান সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও, সমাজ সামাগ্রিকভাবে এটা উপলব্ধি করতো যে, ভিক্ষা করার চাইতে না করাই নিঃসন্দেহে উত্তম। এই বিষয়টিকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার জন্য হযরত রসূলে পাক (সা.) বলেছেন:

'দাতার হাত গ্রহীতার হাত থেকে উত্তম।' (হাদীস)

এর ফলে এমনও হতো যে, অনেক মুসলমান ভিক্ষা করে বেঁচে থাকার চাইতে দারিদ্র্যের কষাঘাতে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করতো। তাদেরকে প্রয়োজনয় খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী সরবারাহ করার জন্য পবিত্র কুরআন গোটা সমাজকেই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের মাঝে এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম করে চলেছে, অথচ তাদের এমন কোন সঙ্গতি নেই যে, তারা দারিদ্রের কবল থেকে রক্ষা পায়:

"(উপর্যুক্ত দানসমূহ) ঐ অভাবীদের জন্য যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা ভূ-পৃষ্ঠে চলাফেরা করতে পারে না। (তারা সাহায্য) চাওয়া থেকে বিরত থাকার কারণে অজ্ঞ লোক তাদেরকে ধনী মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের চেহারার লক্ষণ দেকে চিনতে পারবে; তারা মানুষের নিকট নাছোরবান্দা হয়ে কিছু চায় না। এবং তোমরা ধন-সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ কর আল্লাহ্ নিশ্চয় তার সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।" (আল্ বাকারা, ২:২৭৪)

এই নীতি আরও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে:

"আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে জনপদসমূহের অধিবাসীগণের নিকট থেকে বিনাযুদ্ধে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তা আল্লাহ্‌র জন্য এবং মুসাফেরদের জন্য যেন তা তোমাদের মধ্য থেকে বিত্তশালীদের মধ্যে চক্রকারে আবর্তিত না হয়। এবং রসূল তোমাদেরকে যা দান করে তা গ্রহণ কর, এবং যা তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে তোমরা বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতীব কঠোর।" (আল্ হাশর, ৫৯:৮)

ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এই নীতির উল্লেখ করেছেন তাঁর এক বাণীতে। যে হাদীসের অংশবিশেষ হচ্ছে:

"... হাকিম বিন নিজাম থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'ওপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম (অর্থাৎ দাতা গ্রহীতার চাইতে উত্তম)। প্রত্যেকের শুরু করা উচিত স্বীয় পোষ্যদের দান করার মাধ্যমে। উৎকৃষ্টতম দান বা সদকা হচ্ছে তাই যা কোন সম্পদশালী ব্যক্তি দান করে (তার ব্যয় নির্বাহের পর বাদবাকী সম্পদ থেকে)। যে ব্যক্তি অপরের কাছে আর্থিক সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকবে, তাকে আল্লাহ্ই দান করবেন, এবং তাকে অপরের কাছে হাত পাতা থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবেন...।"

দান বা সেবার ক্ষেত্রে তো তোমার হাতই ওপরে, অর্থাৎ তোমার উচিত দান করা এবং সেবা করা; দান গ্রহণ করা বা কৃপাপ্রার্থী হওয়া তোমার উচিত নয়।

দান বা সদকা'র দ্রব্যাদি

আপনি কিভাবে দান করেছেন সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আপনি কি দান করছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি এমন কিছু দান করেন যা গ্রহণ করতে গেলে আপনি নিজেই লজ্জিত বোধ করবেন, তা হলে তা আল্ কুরআনের দৃষ্টিতে দানের সংজ্ঞার মধ্যে পড়বে না। এটা হবে কোন কিছুকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করার শামিল।

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু থেকে যা তোমরা উপার্জন কর, এবং তা থেকেও যা আমরা তোমাদের জন্য যমীন থেকে উৎপন্ন করি, এবং তোমরা নিজেরা চক্ষু বন্ধ না করে আদৌ তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, সকল প্রশংসার যোগ্য।" (আল্ বাকারা, ২:২৬৮)

"ওগুলোর মাংস ও ওগুলোর রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁর নিকটে তোমাদের তরফ থেকে তাক্ওয়া পৌঁছে।" (আল্ হাজ্জ, ২২:৩৮)

দান প্রকাশ্যে ও গোপনে

ইসলাম উভয় পন্থাই উন্মুক্ত রেখেছেঃ দান-খয়রাত প্রকাশ্যেও করা যাবে, গোপনেও। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হচ্ছেঃ

"এবং যা কিছু তোমরা খরচ কর অথবা যা কিছু তোমরা নযর-মানত কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন, এবং যালেমদের জন্য কোনও সাহায্যকারী হবে না। এবং যদি তোমরা প্রকাশে সদকাহ্ কর, তাহলে তা-ও খুব ভাল এবং যদি তোমরা তা গোপনে দান কর এবং তা গরীবদেরকে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্য আরও বেশী ভাল, এবং তিনি (এজন্যে) তোমাদের যাবতীয় অনিষ্ট তোমাদের নিকট থেকে দূরীভূত করে দিবেন। এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সাম্যক অবগত আছেন।" (আল্ বাকারা, ২:২৭১, ২৭২)

সামাজিক দায়িত্বাবলী

ইসলামে এই বিষয়টিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত যে, কর্তৃপক্ষ যারা তাদেরকে অবশ্যই জনগণের খেদমতের ব্যাপারে সংশোধনশীল থাকতে হবে, যাতে করে কোন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা প্রেশারগ্রুপ গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেয়।

পবিত্র কুরআনের মতে, শাসক অধীনস্থ বা তার এখতিয়ারভুক্ত লোকদের অবস্থার জন্য দায়ী হবে এবং তাকে সেজন্য খোদা তা'লার কাছে জবাবদিহি হতে হবে। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সা.) একটি হাদীসে আমরা দেখতে পাই:

'তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন এমন মেষপালক যে, মেষপালটি যার মালিকানাধীন নয়। (তবু সে মেষপালটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী)। তাকে জবাবদিহি হতে হবে।'

এই হাদীসে মানবীয় সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব পালনের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন, মনিব ভৃত্যের জন্য দায়ী, মা (যিনি গৃহকর্ত্রী), পিতা (যিনি পরিবার-প্রধান) উভয়েই গোটা পরিবারের জন্য দায়ী; নিয়োগকর্তা তার কর্মচারীদের জন্য দায়ী, ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই হযরত রসূলে পাক (সা.) বার বার করে বলেছেন: 'মনে রেখো!

এজন্য তোমাকেই দায়ী করা হবে,
এবং তোমাকে জবাবদিহি হতে হবে।'

একটি দৃষ্টান্ত প্রাথমিক ইসলাম থেকে

একদা ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এক রাতে মদীনার শহরতলীর একটা গলি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা তাঁর একটা রীতি ছিল যে, তিনি ছদ্মবেশে অলিগলিতে ঘুরতেন এবং স্বচক্ষে দেখতেন যে, তাঁর শাসনাধীনে জনসাধারণ কিভাবে দিন কাটাচ্ছে। ঐ গলি পথে চলতে চলতে তিনি শুনতে পেলেন যে, একটা বাড়ীর মধ্যে ছেলেমেয়ে কান্নাকাটি করছে এবং

মনে হচ্ছে যেন তারা দারুন কোন কষ্টে পড়েছে। তিনি খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন যে, গোটা তিনেক ছেলেমেয়ে একটা চুলোর পাশে বসে আছে, চুলোটাতে আগুন জ্বলছে এবং তার ওপর একটা কেটলী জাতীয় পাত্রে কি যেন চাপানো হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এবং এই ছেলেমেয়েদের মা-ও বসে আছেন তাদের সাথে ঐ জ্বলন্ত চুলোটার পাশেই। তিনি জানতে চাইলেন ব্যাপার কি, কি হয়েছে? মহিলাটি বললেন, 'ছেলে মেয়েগুলো ক্ষুধার্ত। তাদেরকে খেতে দেওয়ারমত আমার কাছে কিছু নেই। তাই আমি এ পাত্রটির মধ্যে কিছু পাথরের নুড়ী ও পানি দিয়ে জ্বাল দিচ্ছি এবং ওদেরকে বুঝ দিচ্ছি যে, একটু সবুর কর, এই খাবার হয়ে গেল বলে। ব্যাপারটা এটাই যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন।'

গভীর মর্মবেদনায় এবং উৎকণ্ঠায় হযরত উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ তাঁর সরকারী দপ্তরে ফিরে এলেন। তিনি খাদ্য গুদাম থেকে একটা বস্তা ভর্তি করে আটা, মাখন, মাংস, খেজুর ইত্যাদি নিলেন। তিনি একজন দাসকে বললেন বস্তাটা তাঁর (রা.) পিঠের ওপর তুলে দিতে। দাস লোকটি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উমরকে (রা.) বললেন, 'আপনি কেন বস্তাটা নিজে পিঠে করে নিয়ে যাবেন, আমিই তো আছি, আমিই তো পারি এটা বয়ে নিতে'। উত্তরে আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা.) বললেন, **'সন্দেহ নেই, তুমি আজ আমার জন্যে এই বোঝা বইতে পারবে, কিন্তু কেয়ামতের দিন কে বইবে আমার বোঝা?'** 'তিনি (রা.) যা বলতে চেয়েছিলেন, তিনি তাঁর প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব কীভাবে পালন করেছিলেন, তার জবাব তো তাঁর পক্ষে শেষ বিচারের দিনে কোন দাস দিতে পারবে না। তাঁর দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হবে। এটা ছিল নিজের প্রতি নিজের নিজেই চাপানো এক প্রকার শাস্তি। কেননা, উমর (রা.) মনে করেছিলেন যে, সেই অসহায় দরিদ্র মহিলা ও তার সন্তানদের সেই দুঃখের জন্য তিনিই দায়ী, যা কিনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, গোটা শহর ও তার যাবতীয় ব্যবস্থাপনার জন্য তিনিই মূলতঃ দায়ী, এ দায়িত্ব তাঁর প্রতি এক আমানত, যার সম্পাদন করতে হবে তাঁকেই।

হযরত উমর (রা.) যা করেছিলেন তা, বস্তুতঃ, কোন সরকার প্রধানের পক্ষে করা অসম্ভব। কিন্তু,মর্মে কর্মে এক্ষেত্রে উমর (রা.) এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন। এবং এটাই সেই দৃষ্টান্ত যার অনুসরণ করা উচিত আধুনিক সব সমাজের। সরকার যদি জনগণের কল্যাণের জন্য এবং তাদের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য সদা সতর্ক থাকে, তাহরে জনগণ তাদের দুঃখ-দৈন্য ও বঞ্চনার অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বেই তা অপনোদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে, এবং তা করবে কোন ভয় বা চাপের মুখে নয়, নিজেদের বিবেকের নির্দেশে ও অনুসাশনে।

ব্যয়ের বর্ধিত সীমানা

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র রাস্তায় (প্রকৃত মুমিনদেরকে) যা কিছু রিযিক্ দান করেছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্‌র রস্তায়) খরচ করে। (আল্ বাকারা, ২:৪)

"এবং আমরা তাদেরকে (প্রকৃত মু'মিনদেরকে) যা কিছু রিযক দান করেছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচে করে।" (আল্ বাকারা, ২:৪)

এখানে এই 'রিযক' শব্দ দ্বারা আল্লাহ্-প্রদত্ত সব দানকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন মানবীয় সকল গুণাবলী, বিশেষ করে সকল বস্তুগত সহায়-সম্পদ, সময়, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং মানবীয় সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা প্রভৃতি। এই বাকাংশটিতে সম্মান, শান্তি, আরাম-আয়েশ ইত্যাদির কথাও বোঝানো হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে কি, এমন কোন কিছুই নেই, যা **'ওয়া মিম্মা রাযাক্‌নাহুম'** এর গণ্ডীভুক্ত নয়।

এছাড়া বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এখানে 'মিন' (আক্ষ. তা থেকে কিছুটা) শব্দটি দ্বারা প্রদত্ত উপদেশকে প্রত্যেকের জন্যই অনুসরণযোগ্য করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তার সবটাই কিংবা তা থেকে একটা সুনির্দিষ্ট অংশ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতে হবে। করণীয় যা তা হচ্ছে, আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু কিছু আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা। এই 'কিছু কিছু' এর পরিধিটা এত বেশী তারতম্যযোগ্য যে, কেউ এমন কি যার দেওয়ার মত তেমন কোন ক্ষমতাই নেই, সেও ইচ্ছা করলে, তার সাধ্যমত এর মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। এটাই হচ্ছে সমাজ সেবার সেই আবহাওয়া যা ইসলাম সৃষ্টি করতে চায়। এটা নির্ভর করে অংশতঃ মানুষের সামাজিক আচরণের ওপর এবং অংশতঃ তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর।

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গোটা সমাজটাই মালিকানা-মুখী এবং কতটুকু নিতে পারলো কেবল সে ব্যাপারেই উদগ্রীব, সেখানে ন্যায্য ও অন্যায্যের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা অত্যন্ত কঠিন এবং অসম্ভব। এমন সমাজের পক্ষে নিজস্ব সীমারেখার ভিতরে সন্তুষ্ট না থেকে অপরের অধিকারের সীমানা লংঘন করা খুবই সম্ভব।

অপর পক্ষে, যে সমাজকে বরাবর স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, এবং এই প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় যে, সে যেন অন্যদেরকে তাদের প্রাপ্যের অদিক প্রদান করে, তার পক্ষে অপরের অধিকার লংঘন করা সম্ভব হবে না। এমন একটা আবহাওয়ায় কোনও শোষণ চালু থাকতে পারে বলে কল্পনা করাও কঠিন।

অপরের সেবা

ইসলামী সেবার যেসব ধারণা বা কন্‌সেপ্ট তার নীতি একটি মাত্র আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং ব্যাপকভাবে:

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়ে থাক এবং অসঙ্গত কাজ থেকে বারণ করে থাক, এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ।" (আলে-ইমরান, ৩:১১১)।

অর্থাৎ, তোমরা তৎক্ষণ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ থাকবে যতক্ষণ সেবক মনোভাবাপন্ন থাকবে। যদি তোমরা অপরের সেবা করতে ব্যর্থ হও তাহলে, তোমাদের পক্ষে শুধু ইসলামী অথবা মুসলিম জাতিভুক্ত হওয়ার কারণে, শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব করার মত কোনও অধিকার থাকবে না।

(চলবে)

আমাদের খোদা

"দিনে রাতে মোর প্রাণে বাজে সদা এই ভুবনের আছে এক খোদা।"

ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে জলসা সালানায় প্রদত্ত বক্তৃতা

মূল **হাফেয ড. সালেহ মুহাম্মদ আলদীন**

(৩য় কিস্তি)

(৫) আমাদের খোদা সৃষ্টিকর্তা

আমাদের খোদার সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন : 'হুয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাওওয়িরুলাহুল আসমাউল হুসনা।' (সূরা হাশর : ২৫)

অর্থাৎ- প্রকৃত বিষয় হলো আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত কিছুর মাঝে বিদ্যমান। আর সমস্ত কিছুকে নিজের ইচ্ছেমত আকৃতিদাতা, তাঁর অনেক গুণাবলী রয়েছে। (অনুবাদ আমীরে সগীর)

সূরা আনআমে বলা হয়েছে–

'বাদিউস সামাওয়াতে ওয়াল আরদ। আন্না ইয়াকুনুলাহু ওয়া লা দু উ ওয়া লাম তা কুল্লাহু সাহিবা। ওয়া খালাকা কুল্লা শাইয়্যিন। ওয়া হুয়া বি কুল্লি শাইয়্যিন আলিম।' (সূরা আনাম : ১০২)

অর্থাৎ- তিনিই আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা। কিরূপে তাঁর পুত্র হতে পারে যখন তাঁর কোন স্ত্রী-ই নেই। এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী, আমরা এক বিশাল সৃষ্টিতে এক বিশাল পৃথিবীতে বসবাস করি। সমস্ত সৃষ্টির তুলনায় আমাদের পৃথিবী কিছুই নয়। রাতের আকাশে আমরা অনেক তারা দেখি। এই সমস্ত তারকা (কিছু তারা ব্যতীত) প্রকৃতপক্ষে সূর্যও এত দূরে থাকত তবে তাকেও একটি তারা মনে হতো। অনেক তারকা এত দূরে অবস্থিত যে, এগুলোকে দেখার জন্য দূরবীনের প্রয়োজন হয়।

আমাদের সৌরজগত– যাকে ইংরেজীতে GALAXY বলা হয়। এতে কোটি-কোটি তারকারাজি বিদ্যমান– যা নিয়ম অনুযায়ী কক্ষপথে ঘুরছে। আবার কোটি-কোটি এমন GALAXY আছে। আমাদের জানার চেয়ে অজানার বিষয়ই অনেক বিশ। সমস্ত কিছুকে আল্লাহ্ স্বীয় মহিমায় সৃষ্টি করেছেন। এবং সমস্ত বিষয়েই তিনি সর্বজ্ঞ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন :

'আলিমুল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাহ্।' (সূরা হাশর: ২৩)

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য-দৃশ্যমান সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

আমাদের খোদা মহাশক্তির অধিকারী। সূরা ইয়াসিনে বলা হয়েছে :

'... ইযা আরাদা শাইয়ান আইয়্যাকুলা লাহু কুন ফায়াকুন।" (সূরা ইয়াসিন: ৮৩)

অর্থাৎ- যখন তিনি কোন কিছু সম্বন্ধে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও'। আর তা হয়ে যায়।

একটু চিন্তা করে দেখুন! শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা এবং ইঙ্গিতে এ সমস্ত পৃথিবী ও চরাচর সৃষ্টি হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লার শক্তির বর্ণনায় এসেছে :

'আল্লাহুল্লাযি রাফাআস্ সামাওয়াতি বিগাইরি আমাদিন তারাও নাহা।' (সূরা রাদ : ৩)

অর্থাৎ- তিনি আল্লাহ্ যিনি আকাশ সমূহকে স্তম্ভ ব্যতীত সমুচ্চ করেছেন।

সূরা গাশিয়ায় বলা হয়েছে:

'আফালা ইয়ানযুরুনা ইলাল কায়ফা খুলিকাত। ওয়াইলাস্সামা-ই কাইফা রুফিয়াত। ওয়া ইলাল জিবালি কাইফা নুসিবাত। ওয়া ইলাল আরদে কাইফা সুতিহাত।' (সূরা গাশিয়া : ১৮-২১)

অর্থাৎ- তারা কি উষ্ট্রগুলির দিকে লক্ষ্য করে না যে, সেগুলিকে কিরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে একে সুউচ্চ করা হয়েছে? এবং পর্বতসমূহের দিকে যে, কিভাবে এদেরকে সংস্থাপিত করা হয়েছে। এবং পৃথিবীর দিকে যে, কিভাবে একে সমসতল করে বিছানো হয়েছে?

"সকল বিষয়ে তার মহিমার প্রকাশ
সকল কাজে দেখি শক্তি তার,
পাহাড়কে দিয়েছেন উচজ্চতা– সাগরকে জল
চারিদিকে হেথা নদী– প্রকাশ তার মহিমার।"

(কালামে মাহমুদ)

আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিতে কোন প্রকার ত্রুটি বা বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

'তাবারাকাল্লাযি বি ইয়াদিহিল মুলকু, ওয়া হুয়াআলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদির।

নিল্লাযি খালাকাল মাওতা ওয়াল হায়াতা লিইয়াবলু ওয়াকুম আইয়্যকুম আহসানু আমলা। ওয়া হুয়াল আযিযুল গাফুর। আল্লাযি খালাকা সাব আ সামাওয়াতিন তিবাকা। মা তারা কি খালকির রাহমানি মিন তা তা ও। ফারজিইল বাসারা, হাল তারা মিন ফুতুর। সুম্মার জি ইল বাসারা কাররা তাইনি ইয়ান কালিব ইলাইকাল বাসারু খাসিআওওয়া হুয়া হাসির।' (সূরা আল-মুলক : ২-৫)

অর্থাৎ পরম বরকতময় ও কল্যাণময়তিনি, যাঁর হাতে সকল আধিপত্য এবং তিনই সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃস্টি করেছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন– তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

তিনি স্তরে-স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তুমি রহমান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবেন। অত:পর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তুমি কি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পাও?

অত:পর তুমি পুন:পুন: দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, (পরিষেশে তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবে এমতাবস্থায় যে, তা অতি ক্লান্ত-শ্রান্ত হবে (তবু কোন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না)।

সূরা মুমিনুন-এ বলা হয়েছে–

'... আল্লাহু আহসানুল খালিকিন।' (সূরা মুমিনুন : ১৫)

অর্থাৎ- আল্লাহ্ সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা।

(৬) আমাদের খোদা 'রাজ্জাক'

আমাদের খোদা 'রাজ্জাক'– অর্থাৎ, তিনি রিযিকদাতা। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

'ইন্নাল্লাহা হুয়ারায্‌যাকু যুল কুওওয়াতিল মাতিন।' (সূরা যাররিয়াত : ৫৯)

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিযিকদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়।

'ওয়া হুয়া ইয়ুত ইমু ওয়ালা ইয়ুত আমু।' (সূরা আনআম : ১৫)

অর্থাৎ- তিনিই সবাইকে খাওয়ান অথচ তিনি পানাহারের উর্ধ্বে।

আমাদের ভারতবর্ষের জনসংখ্যা মা'শা'আল্লাহ্ ৯০ কোটিরও বেশি। সমস্ত চাষযোগ্য জমির উৎপাদন ক্ষমতা এর পাঁচগুণ বেশি। আল্লাহ্‌ই সবাইকে খাওয়াচ্ছেন। মানুষ ছাড়াও অন্যান্য পশুপাখি, মাছ ও অন্য প্রাণী পৃথিবীতে বিদ্যমান। প্রত্যেকে জন্য ভিন্ন প্রকারের খাদ্য আবশ্যক। সবার জন্য আল্লাহ্ তা'লাই ব্যবস্থা করে থাকেন। কুরআন মজিদ ঘোষণা করছে–

'ওয়ামামিন দাব্বাতিন ফিল আরদে ইল্লা আলাল্লাহি রিযকুহা...।" (সূরা হুদ : ৭)

অর্থাৎ- এবং ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন বিচরণকারী জীব নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র ওপর নেই।

'পশু পাখি আর সাগরের মাছ
আপন অংশে খায়– তিনি রাজ্জাক,
ভান্ডার অশেষ– সদা দেন তিনি
আশ্রয়দাতা, জীবিত, জীবনদায়ী যিনি।'

(কালামে মাহমুদ)

রিযিক নিজে-নিজেই আসে না বরং আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছাতেই এসে থাকে। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন : 'আম্মান হাযাল্লাযি ইয়ার যুকুকুম ইন আম সাকা রিযকা...।' (সূরা মুলক : ২২)

অর্থাৎ- অথবা সে এমন কে যে তোমাদেরকে রিযিক দিবে যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন?

যদি আল্লাহ্ তা'লা রিযিক দেয়া বন্ধ করে দেন, তাকে এমন কেউ নেই যে রিযিক দিতে পারে। তিনি মানুষের পরিশ্রম এবং অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছে। স্বীয় প্রজ্ঞাবলে কাউকে বেশি, কাউকে কম দিয়ে থাকেন। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলে রেখেছেন :

'ইন্না রাব্বাকা ইয়াবসুতুর রিযকা লি মইয়্যা শা-ও, ওয়া ইয়াকদির। ইন্নাহু কানা বি-ইবাদিহি খাবিরাম বাসিরা।' (সূরা বনী ইসরাইল : ৩১)

অর্থাৎ- নিশ্চয় তোমার প্রভু যার জন্য চান রিযিক প্রসারিত করে দেন এবং (যার জন্য চান) তা সংকুচিত করেন। নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত, পর্যবেক্ষণকারী।

কুর্ন মজিদ বলছে :

'... ইন্নাল্লাহা ইয়ারযুকু মাইয়্যাশা-ও বিগাইরি হিসাব।' (সূরা আলে ইমরান : ৩৮)

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে চান বেহিসা রিযিক দান করেন। মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করেন। তাকে আল্লাহ্ তা'লা কাল্পনিকভাবে রিযিক দান করেন। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন :

'... মাইয়াত্‌তকিল্লাহা ইয়াজ আল্লাহ্ মাখরাজা। ওয়া ইয়ারযুক্‌হু মিন হাইসু লা ইয়াহ তাসিবু। ওয়া মাইয়্যাতা ওয়াক্‌কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহু।' (সূরা আত্-তালাক : ৩-৪)

অর্থাৎ- যে আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে–তিনি তার জন কোন না কোন উদ্ধারের পথ করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন দিক হতে রিযিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। এবং যে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অজস্র প্রয়োজন পূর্ণ করে থাকেন। আমাদের ওপর তাঁর অজস্র অনুগ্রহ রয়েছে। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন :

'আল্লাহুল্লাযি সাখ্‌খারালাকুমুল বাহরা লি তাজরি ইযার ফুলকু ফি-হি বি আমরিহি

ওয়া লি তাবতাগু মিন ফাদালিহি ওয়া লা আল্লাকুম তাশকুরুন।

ওয়া সাখ্‌খাররা লাকুম মাফিস্‌সমাওয়াতে ওয়ামাফিল আরদে জামি আম মিনহু। ইন্নাফি যালিকা লা আইয়া তিললি কাওমি ই-ইয়া তাফাক্কারুন।' (সূরা আল জাসিয়া: ১৩-১৪)

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তিনি– যিনি সমুদ্রকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছেন যেন তাঁর আদেশে তাতে নৌযানগুলি চলাচল করতে পারে এবং যেন (তা দ্বারা) তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। এবং যা কিছু আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে আছে সব কিছুই তিনি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করছেন :

'ওয়ামা বি কুমমিন নি'মাতিন ফা মিনাল্লাহি সুম্মা ইযা মাস্‌সাকু সুদ্‌দুররু ফা ইলাইহি আজ আরুন।' (সূরা নহল : ৫৪)

অর্থাৎ- এবং যে নেয়ামতই তোমাদের কাছে আছে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেক প্রাপ্ত। অতঃপর যখন কোন কষ্ট তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁরই কাছে (সাহায্যের জন্য) প্রার্থনা করে থাক।

'ওয়া ইন তা উদ্‌দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহ সু হা। ইন্নাল্লাহা লা গাফুরুর রাহিম।' (সূরা নাহল : ১৯)

অর্থাৎ- এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে গণনা করতে চেষ্টা কর, তাহলে তোমরা আদৌ সেগুলির সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(৭) আমাদের খোদা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত

আমাদের খোদা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। সূরা তাগাবুন-এ আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র গুণাবলী এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে;

'ইয়ুসাব্বিহু লিল্লাহে মা ফিস সামাওয়াতে ওয়ামা ফিল আরদ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়্যিন কাদির।' (সূরা তাগাবুন : ২)

অর্থাৎ- আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ (পবিত্র ও মহিমা ঘোষণা) করছে, তাঁরই জন্য আধিপত্য এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

'হুয়াল্লাযি খালাকাকুম ফা মিনকুম ফাকিরুও ওয়া মিনকুম' মিন। ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালুনা বাসির।' (সূরা তাগাবুন : ৩)

অর্থাৎ- তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে পরম সুন্দর করেছেন, এবং তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

'ইয়ালামু মা ফিসসামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়াইয়া'লামু মা তুসরিরুনা ওয়ামা তু' লিনুন। ওয়াল্লাহু আলিমুম বিযাতিস্ সুদুর'। (সূরা তাগাবুন : ৫)

অর্থাৎ- আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে– তিনি সবই পরিজ্ঞাত আছেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর সবাই তিনি জানেন এবং বক্ষে যা কিছু নিহিত আছে তা-ও তিনি সবিশেষ অবগত আছেন।

সূরা কাফ-এ বলা হয়েছে :

'ওয়ালাকাদ খালাকনাল ইনসানা ওয়া না'লামু মা তুওয়াস ওয়িসু বিহি নাফসুহু। ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হানিল ওয়ারিদ।'

অর্থাৎ- এবং নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার আত্মা তাকে যা কিছু পরোচনা দেয় তা-ও আমরা জানি। এবং আমরা জীবন শিরা অপেক্ষাও তার অধিকতর নিকটে আছি।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জীবন শিরার চেয়েও নিকটে। আমাদের হৃদয়ে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন। যেকোন কাজ করার সময় আমাদের নিয়ত, আমাদের অনুপ্রেরণা ও অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা অবগত থাকেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নয়।

"সেই বড় কোন কিছুই নয়
তাঁর চক্ষুর আড়াল।
পাপ-পুণ্য দ্রষ্টা তিনি
হৃদয়েও দেয়া যায় না দেয়াল।"

(কালামে মাহমুদ)

(৮) আমাদের খোদা দোয়া শ্রবণকারী ও প্রার্থনার জবাব দানকারী

কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন :

'ওয়া ইযা সা-আলাকা ইবাদি আন্নি ফা ইন্নি কারিব। উজিবু দা'ওয়াতা দ্দায়ে ইযা দা আনে ফালইয়াস তাজিবুলি ওয়াল ইয়ু'মিনু বি লা আল্লাহুম ইয়ারশুদুন।' (সূরা বাকারা : ১৮৭)

অর্থাৎ- এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল০, 'আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যেন তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।'

কুরআন করীমে বলা হয়েছে :

'আম্মা ইয়্যু জিবুল মুদ তাররা ইযা দা আহু ওয়া ইয়াক শিফুস্ সু'তনা ওয়া ইয়াজ আলুকুম খুলাফা আল আরদ্। আ ইলাহুম্মা আল্লাহি কালি লাম্মা তাযাক্কারুন।' (সূরা আন নামল : ৬৩)

অর্থাৎ- অথবা কে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির দোয়া শুনেন, যখন সে তাঁর নিকট দোয়া করে এবং তার কষ্ট দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করে দেন? আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য কোন মাবুদ আছে? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

কুরআন পাকে দোয়া কবুলিয়তের অনেক মহান ঘটনাবলী বিবৃত আছে। বর্তমান

যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণ-এর অনেক দোয়া কবুলিয়তের ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ্ তা'লা শুধু দোয়া শুনেনই না– উপরন্তু জবাবও দিয়ে থাকেন। নিজের প্রিয় বান্দাদের সাথে কথোপকথনও করে থাকেন। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা প্রিয় বান্দাদের সাথে বাক্যালাপের উল্লেখও পাওয়া যায়। যেভাবে কুরআন মজিদে এসেছে :

"ওয়া কাল্লা মাল্লাহু মুসা তাকলিমা।"

অর্থাৎ- এবং আল্লাহ্ মুসার সাথে অনেক বাক্যালাপ করেছেন।

বর্তমান যুগে মানুষের মধ্যে এই ভুল ধারণা জমেছিল যে, আল্লাহ্ তা'লার বাক্যালাপের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই ভ্রান্তিকে দূর করেছেন এবং বলেছেন, নি:সন্দেহে আঁ-হযরত (সা.) শেষ শরীয়তবাহী নবী ছিলেন এবং এখন আর নতুন শরিয়ত আসতে পারে না। কিন্তু এর র্থ এই নয়, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম হওয়ার ধারা চিরতরে বন্ধ বন্ধ হয়ে গেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমাদের খোদা সেই খোদা যিনি এখনও জীবন্ত যেভাবেতিনি পূর্বেও জীবিত ছিলেন আর একনও তিনি কথা বলেন যেভাবে তিনি পূর্বে কথা বলতেন আর এখানো তিনি শুনেন যেভাবে পূর্বে শুনতেন। এই ধারণা নিতান্তই ভুল যে, এখন তিনি শুনে তো থাকেন কিন্তু কিছু বলেন না। বরং তনি শুনেন এবং বলেনও। তার সমস্ত গুণাবলী চিরন্তন, কোন গুণাবলীই রহিত হওয়ার নয় এবং কখনো রহিত হবেও না।" (আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০ খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বহু বাক্যালাপ করেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

"আমার জীবন্তও চিরস্থায়ী খোদা আমার সাথে মানুষের মতো কথা বলেন। আমি কোন প্রশ্ন করলে এবং দোয়া করলে তিনি ঐশী শক্তিপূর্ণ শব্দাবলী দ্বারা উত্তর দেন। যদি এই ধারণা হাজার বারও হয় তবুও তিনি জবাব দিতে কার্পণ্য করেন না। তিনি স্বীয় বাক্যে আশ্চর্যজনক গুপ্ত খবর প্রকাশ করেন এবং আশ্চর্যজনক শাক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। এমনকি তিনি প্রমাণ করে দেন যে, তিনিই সেই সত্তা– যাকে খোদা বলা উচিত। তিনি দোয়া কবুল করেন এবং কবুল হওয়ার খবর দেন। তিনি বড়-বড় বিপদাবলী সমাধা করেন এবং মৃতের মতো অসুস্থতারও দোয়ার ফলশ্রুতিতে জীবিত করেন। আর এসব ইচ্ছা স্বীয় নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করেন।

"তিনি খোদা যিনি আমাদের খোদা। তিনি স্বীয় বাক্যাবলীতে ভবিষ্যতে আগমনকারী ঘটনাবলী দ্বারা আমাদের জন্য প্রমাণ করেন যে, জমিন ও আসমানের খোদা তিনি।"

(নাসিমে দাওয়াত, রূহানি খাযায়েন, ১৯ খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরেক কবিতায় বলেন :

"সেই খোদা এখানো যার সাথে চান
বাক্যালাপ করেন
স্বীয় প্রেমাস্পদের সাথে এখনো তিনি কথা
বলেন।"

ভাবানুবাদ: **মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়**

Newly Released

Please visit
Pakkhik Ahmadi Website :
www.theahmadi.org

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit:
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

৪৪তম কেন্দ্রীয় তালীম ও তরবিয়তী ক্লাশ ২০১৮

২৩-৩০ মার্চ

স্থান : দারুত তবলীগ মসজিদ,
৪ বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

খোদ্দাম আতফালদের উক্ত ক্লাসে অংশগ্রহণের বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোহতামীম তালীম
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর– ৭৯)

বিভ্রান্তিমূলক অপ-প্রচার বন্ধের জন্য আহ্বান (৬)

অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, 'প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী' হওয়ার দাবীকারকের সত্যতা পরীক্ষার জন্য কি কি প্রমাণ রয়েছে?

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নোক্ত দুটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে আমরা এই পর্যায়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর সত্যতার যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করবো:

(ক) পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সার্বিকভাবে দাবিকারকের ওপর প্রযোজ্য হয় কি-না এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যথার্থভাবে পূর্ণ হয়েছে কি-না?

(খ) যে সময় বা যুগে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে সেই যুগের লক্ষণমূলক অবস্থাবলী এবং বিশেষ চিহ্নাবলী কোন ঐশী সংস্কারকের আবির্ভাবের সাক্ষ্য বহন করে কি-না?

উল্লেখিত দুটি আলোচ্য বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যার মধ্য থেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রথম বিষয়ে সাতটি প্রমাণ এবং দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে সাতটি অর্থাৎ মোট চৌদ্দটি সাক্ষ্য-প্রমাণ সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলো।

বিস্তারিতভাবে জানার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং সংশ্লিষ্ট বরাতোক্ত পুস্তকাবলী এবং আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর ৮৮ খানা পুস্তক এবং অন্যান্য প্রকাশনা দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য যে, আরো দুটি বিষয় অর্থাৎ (গ) দাবীকারকের সত্যতার সমর্থনে প্রকাশিত বড়ো বড়ো নিদর্শন সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং (ঘ) দাবীকারকের ব্যক্তি চরিত্র সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণ পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

[নোট: পবিত্র কুরআনের বিসমিল্লাহ আয়াতকে এক নম্বর আয়াত ধরে আয়াত নম্বর দেয়া হয়েছে– কারণ ঐ আয়াত সূরার অংশ বলেই প্রমাণিত]

দাবীর সত্যতার চৌদ্দটি সাক্ষ্য-প্রমাণের তালিকা:

সংশ্লিষ্ট প্রমাণগুলোর একটি তালিকা সর্ব প্রথমে উপস্থাপন করা হলো যাতে যেকোন অনুসন্ধানী পাঠক প্রত্যেকটি সাক্ষ্য-প্রমাণের সংগে অবশিষ্ট প্রমাণগুলোর আন্তঃসম্পর্কিত তাৎপর্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি প্রমাণ যেমন এককভাবে (Exclusively) শক্তিশালী প্রমাণ– তেমনিভাবে সবগুলো প্রমাণ মিলিতভাবে (Inclusively) বিচার বিশ্লেষণ করলে আরো বেশী শক্তিশালী এবং অকাট্য যুক্তি-নির্ভর অবস্থানের মাধ্যমে দাবীকারকের সত্যতার প্রতি অবিচল বিশ্বাসের ঘোষণা করতে সাহায্য করবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে দাবী–কারকের সত্যতার প্রমাণ এক–নজরে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১) আধ্যাত্মিকভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআ, ৩-৪ আয়াত:

এই আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিজ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আধ্যাত্মিকভাবে (বুরুজী রঙ্গে) একজন মহা-সংস্কারকের আবির্ভাবের মাধ্যমে উক্ত প্রতিশ্রুতির বর্ণনা রয়েছে (বুখারী)। অন্যান্য হাদীসে সেই ধর্মীয় সংস্কারককে কখনও প্রতিশ্রুত মসীহ বা ঈসা এবং কখনও ইমাম মাহদী এবং কখনও উভয় নামেই অভিহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সূরা জুমুআর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দৈহিকভাবে এই পৃথিবীতে মহনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পুনরাগমনের প্রশ্ন যেমন সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব, তেমনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা বহির্ভূত বিষয়।

২) হযরত ঈসা (আ.)-এর সদৃশ সংস্কারকের আবির্ভাব সম্পর্কে সূরা আন-নূর এবং হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী:

পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নূর, ৫৬ এবং আল মুযাম্মেল, ১৬ আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের তেরশত বছর পর অর্থাৎ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বনী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর সদৃশ সংস্কারকের আগমনের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে।

৩) আগমনকাল সম্পর্কে সূরা সাজদাহ এবং হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী:

পবিত্র কুরআনের সূরা সাজদাহ, ৬ আয়াতে এবং হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–এর আগমনের ৩০০+১০০০ বছর অর্থাৎ ১৩০০ বছর পর ইসলামের পূনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ-প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত মহা-সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, তৌরাতসহ আগমনকারী হযরত মূসা (আ.)-এর আবির্ভাবের ১৩০০ বছর পর ইস্রায়েল জাতির বহু দলে-উপদলে বিভক্তি এবং অধঃপতনের যুগ-সন্ধিক্ষণে যেমন বনী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আ.) আবির্ভূত হয়েছিলেন ইহুদীদের বারটি গোত্রের ত্রানকর্তা হিসেবে, তেমনিভাবে পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ শিক্ষা তথা ইসলামী শরীয়ত নিয়ে বিশ্ব–নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের ১৩০০ বছর পর বহু দলে-উপদলে বিভক্ত এবং কলহ-কোন্দলে নিমজ্জিত মুসলিম উম্মতকে একতাবদ্ধ করার জন্য এবং ইসলামের পূর্ণ-প্রচার এবং মহা-বিজয় সম্পর্কিত ঐশী–প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) যথা-সময়ে প্রেরিত হয়েছেন (সূরা নূর: ৫৬ এবং সূরা মুযাম্মেল: ১৬, সূরা ফাতহ, ২৯-৩০ আয়াত দ্রষ্টব্য)। আগমনকালের তথা আখেরী যুগের সনাক্তকারী চিহ্নাবলী এবং লক্ষণাবলী বিশেষভাবে বর্তমান যুগের ঘটনাবলী দ্বারা সত্যায়িত।

৪) ইসলামের মহা-বিজয় সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী:

পবিত্র কুরআনের সূরা সাফ: ১০, সূরা তাওবা: ৩৩ এবং সূরা ফাতহ: ২৯-৩০ এবং সূরা শামস্: ২-৫ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) এবং প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের মহা–বিজয়াভিযান বর্তমান যুগে পরিচালিত হয়ে চলেছে শত বাধাবিঘ্ন এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও।

৫) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা:

পবিত্র কুরআনের সূরা হিজর: ১০, বাইয়্যেনাহ: ৩-৫ এবং সূরা বুরুজ: ২২-২৩ এবং মুজাদ্দিদের আগমন সংক্রান্ত হাদীসের ভবিষ্যদ্বানী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। ফলতঃ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদের আগমন হয়েছে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে। আখেরী যুগের বিশেষ প্রয়োজনের কারণে সেই ব্যক্তি একাধারে মুজাদ্দিদ, মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করেছেন ঐশী নির্দেশের ভিত্তিতে।

৬) 'উম্মতী নবী' হিসেবে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী:

পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাব: ৪১, সূরা আন নিসা: ৭০, সূরা ফাতেহা: ৭, এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'উম্মতী নবী' হিসেবে এবং হাদীস অনুযায়ী 'ঈসা নবীউল্লাহ' এবং 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধী-বিশিষ্ট প্রতিশ্রুত মহা-পুরুষের আগমন হয়েছে– মুহাম্মদী উম্মতের মধ্য থেকে। বনী ইস্রায়েলী নবীর সদৃশ অর্থাৎ 'মসীলে ঈসা' হিসেবে তাঁর আগমন হয়েছে। 'আকাশ' থেকে অথবা গুহা-গহব্বর থেকে কোন মসীহ বা মাহদীর সশরীরে আবির্ভাব হওয়া যেমন মুখরোচক কেচ্ছা-কাহিনীর নামান্তর, তেমনিভাবে পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণরূপে পরিপন্থি। রূপক অর্থে অবশ্যই মাহদী ও মসীহ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের মূল বিষয়টির পূর্ণতা লাভ করেছে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার মাধ্যমে।

৭) পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বনী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ এবং রূপকার্থে তাঁর দ্বিতীয় আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা:

পবিত্র কুরআনের ত্রিশটি আয়াত (যেমন সূরা আলে ইমরান: ৫৬, মায়েদা: ১১৮, বাকারা: ৩৭, আলে ইমরান: ১৪৫, নিসা: ১৫৯-১৬০, ফুরকান: ২১, সাফ: ৭ এবং অন্যান্য আয়াত) এবং হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বনী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর পুনরাগমনের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেগুলো দ্বারা 'ঈসা-সদৃশ' বা 'মসীলে ঈসা' হিসেবে 'মুহাম্মদী উম্মত' হতেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর আগমন হয়েছে এবং রূপক অর্থে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

আখেরীযুগের বিশেষ লক্ষণ ও চিহ্নাবলী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী:

৮) আখেরী যমানার বিশেষ নিদর্শনাবলী:

সূরা তাকবীর: আয়াত ৪-১৫ এবং সূরা ইনশিকাক এবং প্রাসঙ্গিক হাদীসে বর্ণিত নিদর্শনাবলী বর্তমান যমানায় পূর্ণতা লাভ করেছে। পবিত্র কুরআনের শেষ পারার সূরাগুলোতে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য মহা পরিবর্তনগুলোর বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে যা বর্তমান যুগের আবিস্কার সমূহ, যুদ্ধ-মহাযুদ্ধের ঘটনাবলী এবং নৈতিক অধঃপতনের কারণ সমূহের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছে। পরিশেষে প্রতিশ্রুত মহা-সংস্কারকের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণ-প্রচারের বাস্তবায়ন দ্বারা ইসলামের মহা-বিজয় সংক্রান্ত সকল ভবিষ্যদ্বাণী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে।

৯) ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের মোকাবিলার প্রতিশ্রুতি:

সূরা আম্বিয়া (আয়াত ৯৬-৯৮), সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত ও শেষ দশ আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের তথ্যাবলী হতে বিষয়টি সম্বন্ধে জানা যায়। ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত তথ্যাবলী হতে একদিকে যেমন ইয়াজুজ–মাজুজ ও দাজ্জালের ফেতনা-ফ্যাসাদ সম্পর্কে জানা যায়, অপরদিকে সেই ফেতনা হতে রক্ষাকারী প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কেও জানা যায়। 'দাজ্জাল' বলতে চরম মিথ্যাচার ভিত্তিক ত্রিত্ববাদী মতবাদ এবং 'ইয়াজুজ-মাজুজ' বলতে পাশ্চ্যাত্যের দুটি প্রধান সামরিক-রাজনৈতিক জোট এবং উহাদের ফেতনার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে রূপক বর্ণনার রীতি পবিত্র কুরআন (আলে ইমরান: ৮) এবং হাদীস এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত বিষয়।

১০) সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র-গ্রহণের অপূর্ব নিদর্শন:

সূরা কিয়ামাহ: (আয়াত ৯-১০), সংশ্লিষ্ট হাদীস এবং ঐতিহাসিক তথ্যাবলী দ্বারা এই

অপূর্ব গ্রহণের ঘটনা প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনকে সত্যায়িত করেছে। ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সনে এরূপ গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে।

১১) মুসলমানদের বহু দল-উপদলে বিভক্তি:

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরান: ১০৪ এবং সূরা আনাম: ১৬০ এর আলোকে মুসলমানদেরকে পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে থাকার নির্দেশ সত্ত্বেও তারা বহু দল ও উপদলে বিভক্ত হয়েছে এবং বর্তমান যুগে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৭২+১ অর্থাৎ ৭৩ দলের মধ্যে একটি দল ব্যতীত অন্যেরা ঝগড়া-বিবাদের আগুনে নিমজ্জিত থাকবে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সেই প্রতিশ্রুত সঠিক দল যা বাস্তব ঘটনার সাক্ষ্য দ্বারা সত্যায়িত।

হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী "বনী ইস্রায়ীল তো ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। তাহাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে (ঝগড়া-বিবাদের আগুনে) নিপতিত হবে– কেবল মাত্র একটি দল ব্যতীত। তাঁরা (সাহাবগণ) বললেন: হে আল্লাহর রসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন, আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সেই পথে যে দল থাকবে" (তিরমিযী) এবং তারা জামাতবদ্ধ থাকবে" (মেশকাত)।

১২) ইহুদী জাতির পুনঃএকত্রীকরণের নিদর্শন:

সূরা বনী ইসরায়ীল: ৫ এবং ১০৫ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইস্রায়েল জাতি সীমালঙ্ঘন এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির ফলশ্রুতিতে বিশেষভাবে দুই বার শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল– প্রথমে হযরত দাউদ (আ.) এবং পরে হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল (মায়েদা: ৭৯ দ্রষ্টব্য)। পরিশেষে খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে (১৯৪৯ সনে) তারা ইস্রায়েল নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একত্রীকরণের সুযোগ লাভ করেছে। ইহুদী জাতির মতই মুসলমান জাতির দুবার আযাবের সম্মুখীন হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (১৭:১০৫ আয়াতে)। প্রথম আযাব এসেছিল যখন হালাকু খানের তাতার বাহিনীর নিকট বাগদাদের পতন ঘটেছিল (১২৫৮ খৃ.)। দ্বিতীয় আযাব আখেরী যামানাতে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ছিল। সেই আযাবের কবল থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) এবং আহমদীয়া খিলাফত ব্যবস্থা প্রকৃত ইসলামের পুণঃপ্রতিষ্ঠার ও পূর্ণ-প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক রক্ষা-কবচ হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে (সূরা সাফ: ১০, সূরা তাওবা: ৩৩ এবং সূরা ফাতহ: ২৯-৩০ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী)।

১৩) পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি চরম অবহেলার সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্বলিত প্রতিশ্রুত শেষ যুগের চিহ্নাবলী:

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি চরম অবহেলা এবং ইসলাম-বহির্ভূত পথ ও পন্থা এবং বেদাতের ছড়াছড়ি সবচেয়ে বেশী হয়েছে বর্তমান যুগে। এই যুগই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর আগমনের যুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে (সূরা আল ফুরকান: ৩১ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস দ্রষ্টব্য)। সূরা ফুরকানের: ৩১ আয়াতে মুসলমানদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে এক সময়ে তারা এই কুরআনকে পরিত্যাগ করবে: "আর (এ) রসূল বলবে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যক্ত (বস্তু) বানিয়ে ছেড়েছে"। (২৫:৩১)।

উপরোক্ত আয়াত (২৫:৩১) যথোপযুক্তভাবে তথাকথিত সেই সকল মুসলমানের প্রতি আরোপিত হতে পারে, যারা কুরআনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছে এবং একে পিঠের পিছনে ফেলে রেখেছে। বিগত চৌদ্দশত বছরে কুরআন কখনো এত বেশি উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়নি যেমন হয়েছে এই যুগের মুসলমান কর্তৃক। নবী করীম (সা.) থেকে এই সম্পর্কে এক হাদীসে বর্ণিত আছে: "ইয়াতি আলান্নাসে জামানুন লা-ইয়াবকা মিনাল ইসলামে ইল্লা ইসমুহু, ওয়ালা ইয়াবকা মিনাল কুরআনে ইল্লা রাসমুহু, মাসাজিদুহুম আমেরাতুন ওয়া হিয়া খারাবুম মিনাল হুদা, উলামাউহুম শাররু মান তাহতা আদিমিস সামায়ে মিন ইনদিহিম তাখরুযুল ফিতনাতু ওয়া ফিহিম তাউ'দু" (বায়হাকী, মিশকাত)। অর্থঃ মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফেৎনা-ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে" (বায়হাকী, মিশকাত)। ফলতঃ বর্তমান যুগই হচ্ছে সেই যুগ। উল্লেখ্য যে, সূরা ফুরকানের উক্ত আয়াত অবশ্যই সাহাবা কেরাম (রা.)-এর প্রতি আরোপিত হতে পারে না। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বরং এরপর তিন শতাব্দী পর্যন্ত সাহাবীগণ, তাবেঈন ও তাবা-তাবেঈন কুরআন পরিত্যাগ করেন নি। ইহা অবশ্যই একটি ভবিষ্যদ্বাণী। ভবিষ্যৎকালে এটা পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। মহানবী (সা.)-এর জাতি কার্যত কুরআন পরিত্যাগ করবে এবং রসূলে করীম (সা.) তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন। বিষয়টি সম্পর্কে বর্তমান যুগের জন্য প্রযোজ্য হাদীসের নিম্নোক্ত বর্ণনা দ্রষ্টব্য:

"ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে, জাহেলিয়াত (আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা) প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, পুণ্যকাজ কমে যাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে, ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারামারি-কাটাকাটি বেশি হবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব হবে, ভূমিকম্প বেশি হবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে মানুষ গৌরব অনুভব করবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন হবে, অধিকাংশ দলের সর্দার ফাসেক (দুর্নীতিপরায়ণ) হবে, জাতির কোন কোন নীচ লোক তাদের নেতা হবে, বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হবে, উটনী বেকার হবে, তাতে চড়ে মানুষ দূরদেশে যাতায়ত করবে না' (বুখারী, মুসলিম)।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন:

* "ইসলামের ভিতরকার অবস্থা এই যে, প্রকৃত তৌহীদের (একত্ববাদ) স্থলে অসংখ্য প্রকারের শিরক ও বেদাতের সৃষ্টি হয়েছে এবং পুণ্য কাজের স্থলে কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা মাত্র বিরাজ করছে।

পীরপূজা ও কবরপূজা এতদূর পৌঁছেছে যে, একে একটি নুতন শরীয়াত (বিধান) বলা যেতে পারে।– আজ তাকওয়া ও তাহারাতের (পবিত্রতার) অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। জেলখানায় যেয়ে দেখ দুর্বৃত্তের সংখ্যা কাদের বেশি। ব্যভিচার, মদ খাওয়া, পরের সম্পত্তি হরণ প্রভৃতি দুষ্কার্য এত বৃদ্ধি পেয়েছে যেন খোদা বলে কিছু নেই। সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে সকল অনাচার দেখা যায় তার আলোচনা করলে একখানা বৃহৎ পুস্তক হয়ে যাবে" (আহ্বান, পৃ. ৮)।

* "ইসলামের অভ্যন্তরে এক ভয়াবহ বিষ-ফোঁড়ের মত বিপদের উদ্ভব ঘটেছে এবং বাইরের দিকে হতে এক কুষ্ঠ রোগ বিস্তার লাভ করে চলেছে। অভ্যন্তরীণ ফোঁড়ার কারণ ঘটিয়েছে স্বয়ং মুসলমানগণ, যারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র শিক্ষা ও উৎকৃষ্ট আদর্শকে পরিত্যাগ করে নিজেদের রায় ও কল্পনা অনুযায়ী তাদের সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনে তৎপর হয়েছে। যে সকল কথা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধ্যান-ধারণা ও কল্পনাতেও ছিল না সেগুলি আজ ইবাদত বলে সাব্যস্ত হয়েছে এবং পরহেযগারী ও তপস্যা সাধনাকে প্রধানত সেগুলির ওপরই নির্ভরশীল করা হয়েছে।" (আল হাকাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, ২৪ মে, ১৯০৫)।

[চলবে]

সম্পাদকীয়'র বাকী অংশ–

সুতরাং মুসলমান শাসক ও প্রজা উভয়েই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিশৃঙ্খলা দুরীকরণের জন্য যিনি এসেছেন তাকে খোঁজ করুন এবং তার আঁচলকে আঁকড়ে ধরুন। সিরিয়ার অধিবাসীরা বিশেষত মুসলমানরা যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ইলহাম **"বালায়ে দামেস্ক"** এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তবে তারা বুঝতে পারবে এই ভবিষ্যদ্বাণী যিনি করেছেন তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তি। তাঁর কথা শুনুন, কেননা, বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী নেই।

খোদা তা'লা মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে বুদ্ধি দান করুন এবং জনসাধারণকেও বুদ্ধি দিন। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন, **"তাআওয়ানু আলাল বিররে ওয়াত তাক্‌ওয়া"** ঠিক সেইভাবে এই আদেশকে ভাবুন এবং তাক্‌ওয়ার কাজে পরস্পর সাহায্যকারী হোন। পুণ্য এবং তাক্‌ওয়ার মাঝে উন্নতি সাধনকারী হোন, ভালোবাসা বিস্তৃতকারী হোন এবং মানুষের হৃদয়কে জয় করুন। জনসাধারণের হৃদয়কে জয় করে তাদের অধিকার প্রদান ব্যতীত সরকার গঠিত হতে পারে না। প্রত্যেক মুসলমান নেতাকে এই মৌলিক জিনিসটি বুঝা প্রয়োজন। এছাড়া নিজেদের ইতিহাসের দিকে একবার তাকান যখন কিনা খ্রিষ্টানরা মুসলমান শাসকদের ন্যায়বিচার দেখে দোয়া করতো, আমরা যেন খুব শীঘ্রই খ্রিষ্টান শাসকদের হাত থেকে মুক্তি পাই এবং আবার মুসলমান শাসকদের অধীনে চলে আসতে পারি। অথচ আজকে মুসলমানরা মুসলমানদের সাথে অন্যায় আচরণ করছে। **রুহামাউ বাইনাহুম**-এর পরিবর্তে গলাকাটা হচ্ছে। আর মুসলমানরা খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে শান্তি এবং আশ্রয় পাবার জন্য, ন্যায়বিচার পাবার জন্য এবং স্বাধীনভাবে থাকার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। হায়! মুসলমান শাসকগণ যদি নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতো! খোদা করুন আমাদের এই বার্তা যেন তাদের নিকট পৌঁছে যায়। একইভাবে পশ্চিমা দেশগুলো এবং পরাশক্তিদের নিকটও যেন আমার বাণী পৌঁছে যায়। আগেই বলেছি, সিরিয়ার বিরুদ্ধে যে কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে তা কেবল এদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সমগ্র বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং প্রত্যেক দেশের আহমদীরা তাদের নিজ নিজ দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি করুন বিশেষ করে যে সমস্ত আহমদী পশ্চিমা দেশগুলোতে বাস করছেন, তারা তাদের রাজনীতিবিদদের এই আগত ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে সাবধান করুন।

আল্লাহ্ তা'লার কাছে একটিই প্রার্থনা, তিনি সমগ্র দুনিয়াকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতাকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। শাসক এবং প্রজাদেরকে নিজ নিজ অধিকার আদায়ের তৌফিক দান করুন এবং সেই ধ্বংসযজ্ঞের যুদ্ধকে শেষ করে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। একইভাবে ইউরোপ এবং পশ্চিমা শাসকরা যেন ন্যায়বিচার করতে পারে এবং অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়। তারা যেন প্রত্যেক ছোট ছোট দেশগুলির অধিকার পূর্ণভাবে আদায় করতে পারে। নিজের স্বার্থের জন্য কোন রাষ্ট্রের সাহায্য না করে বরং তা যেন অধিকার আদায়ের জন্য হয়। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের সকল সদস্যকে সেই খারাপ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন বিশেষ করে সিরিয়াতে অনেক আহমদী এই ঘটনার ফলে প্রভাবান্বিত হচ্ছেন। **"বালায়ে দামেস্ক"** এই ইলহামটি সিরিয়ার জন্য একটি সাবধান বাণী। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সিরিয়ার জন্য প্রশান্তিমুলক যে ইলহামটি রয়েছে তা-ও খুব শীঘ্রই পূর্ণ করুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"ইয়াদউনা লাকা আবদালাশ্ শামে ওয়া ইবাদাল্লাহে মিনাল আরাবে"** অর্থাৎ তোমার জন্য সিরিয়ার সাধুগণ এবং আরবের বান্দাগণ দোয়া করছে। আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র আরববাসীকে খুব শীঘ্রই মুহাম্মদী মসীহের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

বর্তমানে **আরব অশান্তি** যাকে পৃথিবীবাসী **"আরব বসন্ত"** নাম দিয়েছে যা পার্থিব কোন বিষয় নয়, সেটিকে আধ্যাত্মিক ঝর্ণাধারায় প্রবহমান করুন। সকলে মিলে যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জন্য দোয়াতে রত হয়ে যায়। আর তাঁর সাথে মিলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও ভালোবাসা এবং শান্তির বাণী সমগ্র দুনিয়াতে প্রচার করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব বুঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। একই সাথে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ কুড়াতে পারি এবং গোটা জগতবাসীকে সত্যের দিকে ধাবমান করতে পারি। আমরা যেন শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী হতে পারি এবং সে শিক্ষাকে বিস্তৃত করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র জগতবাসীকে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং ধ্বংসযজ্ঞতার হাত থেকে মুক্তি প্রদান করুন, আমীন।

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(১৫তম কিস্তি)

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা নাসের আহমদ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) এর হৃদয় বিদারক ইন্তেকাল

আমরা রাবওয়াবাসী ফজরের নামাযের কিছু সময় পূর্বে এ খবর জানলাম যে হুযুর (রহ.) ইন্তেকাল করেছেন। অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেল। সমস্ত পরিবেশ মর্মাহত ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। প্রত্যেকের চোখে অশ্রু দেখা যাচ্ছিল। কেউ চিৎকার করে কাঁদেনি। কিন্তু সবাই মাথা নিচু করে হাঁটছিল। ৮-৯ জুন ১৯৮২ইং রাত ১২ টার পরে হুযুর (রহ.) ইন্তেকাল করেছিলেন। জামাতের খুব সুন্দর সুশৃঙ্খল নেযাম (ব্যবস্থাপনা) দেখলাম। মরকেয থেকে দেশ বিদেশের প্রধান কার্যালয়ে খবর পাঠানো হচ্ছিল। সেখান থেকে জেলাগুলোতে এবং সেখান থেকে স্থানীয় জামাতগুলোতে খবর পাঠানো হচ্ছিল। আমাদের রাবওয়ার প্রধান সদর উমুমীর দফতরে, তারপর সেখান থেকে হালকা প্রেসিডেন্ট সাহেবদের কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে বাসায় বাসায়।

আমি দেখলাম চতুর্দিকে নিরবতা, দুঃখভারাক্রান্ত মানুষ। সবাই যার যার কাজে যাচ্ছেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ কথা বলছেন না।

মোহতরম মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব নাযের এসলাহ্ ও এরশাদ আমাদের মুরুব্বীদের মসজিদে মসজিদে ডিউটি লাগিয়ে দিলেন। সে সময় ২৯টি মসজিদ রাবওয়াতে ছিল। আমার ডিউটি মসজিদে মোবারকে দেয়া হল। ঘোষণা হয়ে গেল, ১০ জুন জোহরের নামাযের পরে মসজিদে মোবারকে মজলিসে ইন্তেখাবে খেলাফতের অধিবেশন হবে, সেখানে চতুর্থ খলিফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে হুযুরের ইন্তেকাল হয়েছিল। বুধবার দুপুর নাগাদ মরদেহ রাবওয়া কসরে খেলাফতে (খলীফাতুল মসীহ্ এর বাসভবন) পৌঁছে গেল। একটি ঘরে মরদেহ রাখা হল যেখানে সব মানুষকে চেহারা দেখানোর ব্যবস্থা করে দেয়া হল। এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সময় নির্ধারণ করে দেয়া হল এত সময় থেকে এত সময় পুরুষরা দেখবেন। আর এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত মহিলারা দেখবেন।

বুধবার সকালে সারা দেশ থেকে আহমদীরা রাবওয়াতে আসা শুরু হয়ে গেল। দারুয যিয়াফতে সকলের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমার ডিউটি মসজিদ মোবারকে দেয়া হল। সবাই নামাযে আসেন। তারপর বাইরে চলে যান। আবার অনেকে মসজিদে বসে থাকেন। সবাই দোয়ায় রত ছিলেন।

বুধবার মসজিদে মোবারকে যোহরের নামাযের পর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এ ঘটনা খুব খারাপ হতে পারত। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে মন্দ কিছু না হয়ে আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রকাশ পেল।

খাকসার মেহরাব থেকে উত্তর দিকে ৮/১০ জন পরে ছিলাম। আমার ডান পাশে আমার সাথে সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ ছিলেন। মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব নাযের এসলাহ এরশাদ মরকযিয়া নামায পড়ালেন। নামায শেষ হবার সাথে সাথে এক মুহূর্তে কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল। নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মেহরাবের দিকে পা বাড়ালেন। খুব দ্রুত মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব এসে সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেবকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং মির্যা রফি আহমদ সাহেবের কানে আস্তে আস্তে বললেন, ধৈর্য ধারণ করুন। দোয়া করতে থাকুন। মওলানা আব্দুল মালেক খান এ দিকে আসলেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ভারপ্রাপ্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ২/৩ টি বাক্য উচ্চারণ করলেন। আসল প্রাইভেট সেক্রেটারী মেজর (অব:) হামিদ কলিম সাহেব ছুটিতে ছিলেন। আমার মনে হল আকাশ থেকে ফেরেশতা কথা বলছে। তিনি বললেন, "আজ রাতে আমাদের রুহানী পিতা ইন্তেকাল করেছেন..."। ঐ সময় যা ঘটে গেল তা অসাধারণ ও অতি উত্তম। ভুল হলে অনেক বড় ভুল হয়ে যেত। সব মানুষ কোন দিকে না দেখে

সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ, নাযেরে আলা (প্রয়াত)-এর সাথে লেখক

কোন কথা না বলে সুন্নত নামায শুরু করে দিলেন।

যোহরের পরপরই দ্রুত এসব কিছু ঘটে যাচ্ছিল। আরো একটি ঘটনা এরকম ঘটতে গিয়ে থেমে গেল। সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেবের বড় ছেলে মির্যা তৈয়্যব আহমদ সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনলাম (তিনি আমার সাথে জামেয়া পাশ করেছেন) মির্যা তৈয়্যব আহমদ মসজিদের উত্তরের গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। তিনি উচ্চস্বরে "... মির্যা রফি আহমদ..."। স্লোগান দেওয়ার মত করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আর বলতে পারলেন না। মসজিদের ভেতরেও আসতে পারলেন না। কারণ সবাই নামায শুরু করে দিয়েছিলেন। অনেকগুলো সাফ বা কাতার (line) ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি। সম্ভবতঃ নামাযে সবাই কাঁদছিলেন।

আমার দৃষ্টিতে এটি আল্লাহর একটি জবরদস্ত জ্বলন্ত নিদর্শন আমরা দেখলাম। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রিয় জামাত হযরত খলীফাতুল মসীহ-এর সাথে মহব্বত করে এমন জামাত, আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকা জামাত খুবই চমৎকার আচরণ করল; কেউ কথা না বলে কোন দিকে না দেখে নামায শুরু করে দিলেন। সুবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মদ।

পরবর্তিতে জানতে পারলাম বুধবার সকালে একটি প্রকাশিত বিজ্ঞাপন রাবওয়ার কেন্দ্রীয় মহল্লা বাদ দিয়ে অন্যান্য মহল্লাগুলোতে প্রচার করা হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)–এর ইন্তেকালের পূর্ব থেকেই একটি গ্রুপ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল।

বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, "আপনারা সবাই বুধবার যোহরের নামায মসজিদ মোবারকে আদায় করবেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব জামাতের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিবেন।" ওদের উদ্দেশ্য গোপন রেখেছিল, মূলতঃ তারা সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদকে কৌশলে খলীফা বানানোর চেষ্টা করেছিল। তাদের পরিকল্পনা এমন ছিল যে যোহরের নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব মেহরাবে গিয়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করবেন। সামনে তাদের অনুসারীরা প্রস্তুত হয়ে থাকবে, তারা উচ্চস্বরে বলবে "মির্যা সাহেব! বক্তৃতা না, আপনি আমাদের বয়াত গ্রহণ করুন। আমরা আপনার হাতে বয়াত করতে চাই।" হৈ চৈ করে বয়াত হবে। হয়ত না বুঝে অনেকেই শামীল হবে। এভাবে সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব চতুর্থ খলীফা হয়ে যাবেন। এরকম তারা ভেবে রেখেছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রা.)-এর সময় যেমন হয়েছিল এখন তারা ঠিক সেভাবেই চেষ্টা করতে চেয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ইন্তেকালের পরে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব ও তার অনুসারীরা বিতর্ক শুরু করেছিলেন। শেষে ১৪ই মার্চ ১৯১৪ তারিখে আসরের নামাজের পর মসজিদ নূরে পরামর্শ সভার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। ঐ সভা আরম্ভ হলে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব বক্তৃতা করতে চেয়েছিলেন । সাহাবারা বলেছিলেন মৌলভী সাহেব! এ সময় আমরা আপনার বক্তৃতা শুনতে চাইনা। আপনি কী বলবেন তা আমাদের জানা; আমরা খলীফার হাতে বয়াত করতে চাই। হযরত মৌলভী মোহাম্মাদ আহসান আমরোহী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ সাহেবের হাতে বয়াত করতে চাই। হুযুর আপনি আমাদের বয়াত গ্রহণ করুন। হযরত মির্যা সাহেব প্রস্তুত ছিলেন না। ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তারপর সবাই বয়াত নিতে জোর অনুরোধ করলেন। অবশেষে হযরত মির্যা সাহেব (মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ) বয়াত গ্রহন করলেন।

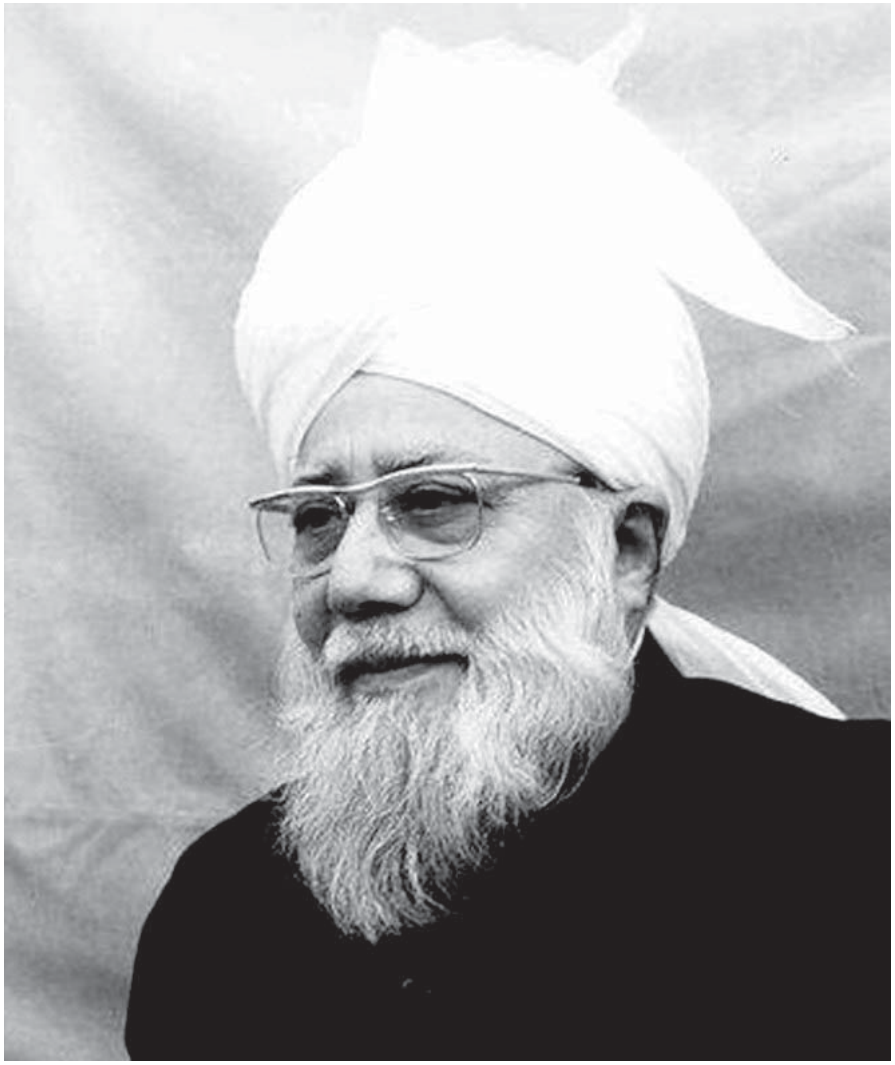

হযরত মির্যা নাসের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) (১৯০৯-১৯৮২)

আজকের এরাও ঐ সময়ের মত (এ সময়) এমন ঘটনা ঘটাতে চেয়েছিল। কিন্তু উপরে যা বলেছি, মানুষ কোন কথা না বলে, কারো কথা না শুনে নামায আরম্ভ করে দিয়েছিল। আল্লাহ স্বয়ং খলীফা নির্বাচন করেন এর জ্বলন্ত প্রমান আমরা দেখলাম। এ সময় চতুর্থ খলীফার নির্বাচন ছিল সবাই জানত যে পরের দিন ১০জুন তারিখে মজলিসে ইনতেখাবে খেলাফতের পূর্ব ঘোষনা মতে নিবার্চন সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে খেলাফতের নির্বাচন হবে।

আল্লাহর তকদীর মত ১০জুন মসজিদে মোবারকে ইনতেখাবে খেলাফতের সভায় চতুর্থ খলিফার নিবার্চন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। নামায যোহর আসর জমা হয়েছিল। তারপর নির্বাচনী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিধান মতে মসজিদের দরজা বন্ধ ছিল। কেবল মজলিসে ইন্তেখাবের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচনে যিনি বেশী পরিমাণ ভোট পান তিনিই খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি প্রথমে মজলিসে ইন্তেখাবের সভার সকলের বয়াত গ্রহন করেন। তারপর মসজিদের মাইকে ঘোষনা দেয়া হয় যে হযরত "সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমেদ সাহেব চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন আপনারা সবাই এখন বয়াত করবেন।" মসজিদের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়।

তখন আমরা প্রায় ৮০ হাজারের বেশী মানুষ হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের হাতে চতুর্থ খলীফা হিসাবে বয়াত করেছি। মসজিদে হয়ত ১০/১২ হাজার মানুষ, বাকী মানুষ মসজিদের বাইরে ছিলেন। ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছিল।

তারপর হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) এর মরদেহ 'বেহেস্তী মাকবেরা' কবরস্থানে নেয়া হয় এবং নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে জানাযার নামায পড়ান। জানাযায় প্রায় এক লক্ষ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তারপর বেহেস্তী মাকবেরার ভেতরে বিশেষ সংরক্ষিত অংশে হযূর (রহ.) কে দাফন করা হয়। দাফন শেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে দোয়া পরিচালনা করেন।

(চলবে)

আমের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয়

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

বাংলাদেশে আম হল ফলের রাজা জাতীয় গাছ। আম সাধারণত উষ্ণ ও অবউষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে ব্যাপক জন্মে। ইন্দো-বার্মা অঞ্চলে আমের উৎপত্তিস্থল বলে ধারণা করা হয়। তবে বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে আম সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল। আম পুষ্টিমান ও স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়। বাংলাদেশে প্রায় সব অঞ্চলে আম জন্মে। কিন্তু দেশের উত্তরাঞ্চলে এর বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। আম চাষীরা প্রতি বছর অনেক ক্ষতির শিকার হয়ে থাকেন সাধারণত দুই প্রকারের সমস্যার কারণে যথা: (১) প্রাকৃতিক কারণ যেমন– ঝড়, শিলাবৃষ্টি, খরা প্রভৃতি) এবং (২) রোড় ও পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়ে। সঠিক পরিচর্চা ও রোগ-পোকামাকড় দমন করে প্রথম ক্ষতি আংশিক এবং দ্বিতীয় ক্ষতি প্রায় সম্পূর্ণ সমাধান করা সম্ভব। নীচে ইহা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল:–

বাংলাদেশের আম: (১) দেশি (গুটি) (২) উচ্চফলনশীল যেমন– লেংড়া, ফজলী, আম্রপলি, বউরাণী, হাড়িভাঙ্গা, আশ্বিনা, হিমসাগর, খিরসাপাতি, গোপাল ভোগ, বুম্বাই, রাজভোগ, জামাই পছন্দ।

(অ) ফলন্ত আমা গাছের পরিচর্চা: আম গাছের ফল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ফলন বাড়ানোর জন্য নিম্নলিখিত পরিচর্চাগুলি করা একান্ত প্রয়োজন।

পরগাছা দমন: আমগাছে একাধিক জাতের আগাছা জন্মাতে দেখা যায় যা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর। পরগাছাসমূহে শিকড়ের মত এক প্রকার হষ্টোরিয়াা হয় যা গাছের মধ্যে প্রবেশ করে রস শোষণ করে খায় এবং গাছটি দুর্বল করে। পরগাছার প্রাদুর্ভাব বেশী হলে গাছের পাতার আকার ছোট হয় ও ফ্যাকাসে হয় এবং অনেক সময় গাছ মারা যায়। এর ফলে গাছের ফলন মারাত্মক ভাবে কমে যায়। তাই ভাল ফলন পেতে হলে অবশ্যই পরগাছা অপসারণ করা দরকার।

সার প্রয়োগ: গাছের বৃদ্ধি ও ফল উৎপাদনের জন্য সারের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। ফলন্ত গাছের আকার, বয়স ও মাটির উর্বরতার ওপর সারের পরিমাণ নির্ভর করে। দুপুর বেলা যতটুকু স্থানে ছায়া পড়ে সেটুকু স্থানে মাটি কুপিয়ে সার মাটির সাথে মিশে দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: শুষ্ক মৌসুমে আম বাগানে পানি সেচ দেয়া দরকার। আমের গুটি মটর দানারমত হওয়ার পর থেকে ১৫-২০ দিন পর পর ২-৩ বার সেচ দিলে আমের গুটি ঝরা বন্ধ হয়।

বয়স্ক টক আমগাছকে মিষ্টি আমগাছে রূপান্তরকরণ: বাগানের কোন গাছের আমের গুণাগুণ খারাপ হলে সে গাছকে নষ্ট না করে ভিনিয়ার কলমের মাধ্যমে উন্নতি সাধন করা যায়। বয়স্ক গাছের ২-৩ টি ডাল কেটে দিলে সেখান থেকে নুতন শাখা বের হলে তার পর নতুন শাখাতে ভিনিয়ার কলম করে নিতে হবে। এ ভাবে ৩-৪ বারে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

পুরাতন বাগান নবায়ণ: আম বাগানের বয়স বেশী হলে ফল ধারণ কমে যায়, তাই এ ক্ষেত্রে গাছ কেটে না ফেলে পুরাতন গাছের ভারী শাখা কেটে দিলে সেখানে নতুন শাখা বের হবে এবং গাছ নবায়ণ হয়ে যাবে। এ ভাবে ২-৩ বছরে বাগান নবায়ণ করা যায়।

ফসল সংগ্রহ: গাছের ফল দুই চারটি পাকা শুরু করলে বাঁশের কোটার মাথায় থলে সদৃশ্য জালতি লাগিয়ে আম পাড়তে হবে যেন আমে আঘাত না লাগে। গাছের নীচে সাময়িক ভাবে রাখতে হলে খড় বিছিয়ে তার ওপর রাখতে হবে। নিম্নোক্ত লক্ষণ দেখে ফল সংগ্রহ করতে হবে ঃ- (১) আমের বোটার নীচে হলুদ বর্ণ ধারণ করবে। (২) পানিতে দিলে ডুবে যাবে। (৩) কস বের হলে দ্রুত শুকিয়ে যাবে। (৪) দুই একটি পাকা আম গাছ থেকে ঝরে পড়বে।

(আ) রোগ দমন:

অ্যানথ্রাকনোজ (Anthracnose)

এর রোগ আমের পাতা ও ফলে হয়ে থাকে। ইহা কোলিটোর্টিকাম গোলেসপোরিওডিস (Colletotrichum gloeosporioides) নামক এক প্রকার ছত্রক দ্বারা হয়ে থাকে। এ রোগের কারণে

আমের ফলন শূন্যের কাছাকাছি আসতে পারে।

লক্ষণসমূহঃ (১) এ রোগ নতুন পাতা, পুষ্পমঞ্জুরী ও ফলে দেখা যায়। (২) পাতায় ধুসর-বাদামী ছোট কৌষিক দান পড়ে এবং পরে সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ও এক পর্যায় পাতা ঝরে পড়ে। (৩) ফলের ওপর প্রথমে গাঢ় বাদামী দাগ পড়ে। (৪) দাগগুলি পরে বড় হয়ে কাল বর্ণ ধারণ করে। (৫) আক্রমণ মারাত্মক হলে পরবর্তীতে সম্পূর্ণ আম পচে যায়।

দমন ব্যবস্থাঃ (১) বোর্দো মিক্সসার ০.৩% হারে ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে (ফুল ধরার পূর্বে ও পরে এবং ফল সংগ্রহের পূর্বে)। (২) বাভিসটিন ডবলিউ/পি ০.২% হারে অথবা ডাইথেন-এম ০.৩% হারে দুই বার (ফুল ধরার পূর্বে ও পরে) স্প্রে করতে হবে।

আমের বোটা ও ফল পচা (Stem and rot)

রোগের লক্ষণসমূহঃ (১) বোঁটার চতুর্দিকে কিছু জায়গা জুড়ে কাল দাগ পড়ে। (২) পরবর্তীতে আমের অধিকাংশ ও সর্বশেষ অংশ পচে কাল রং ধারণ। (৩) আক্রান্ত স্থানে চাপ দিলে ভিতর থেকে পচা কাল গন্ধযুক্ত আমের রস বের হয়ে আসে।

রোগ দমনঃ ক) যে কোন একটি পদ্ধতিতে রোগ দমন করবেন: (১) ডাইথেন-এম-৪৫, ০.৩% হারে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। (২) রিডোমিল ০.১% হারে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। (৩) রোভরাল ০.১% হাতে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। (খ) আরম হারভেষ্ট করার পর ৪৩ ডিগ্রী সে তাপমাত্রায় ৫ মিনিট ৬% বোরাক্স দ্রবনে চুবাতে হবে। (গ) ফল সংগ্রহ করার পর ডালপালা, অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করতে হবে।

আমের পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew of mango) রোগের কারণ: এ রোগ ওডিয়াম মেংগিফেরা (Oidium mangiferae) নামক ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণসমূহঃ (১) পুষ্পমঞ্জুরী ও উহার সংলগ্ন কচিপাতা এবং ছোট ফলের ওপর সাদা-ধুসর পাউডার দেখা যায়। (২) সাধারণত সংক্রমণ পুষ্পমঞ্জুরী অগ্রভাগ ক্ষত শুরু করে নীচের দিকে ধাবিত হয় এবং কুচকে যেয়ে ডাই-বেক লক্ষণ প্রকাশ পায়। (৩) ফল অপরিপক্ক অবস্থায় ঝরে পড়ে এবং বিকৃত ও বিবর্ণ হয়।

দমন ব্যবস্থাঃ (১) আমের বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। (২) ছত্রাকের গঠন ধ্বংস করতে মাঝে মাঝে গাছে পানি স্প্রে করতে হবে। (৪) ম্যালাথিয়ন ০.২% হারে ফুল ফোটার পর একবার ও গুটি আসার পর ১৫ দিন পর পর দুই বার স্প্রে করতে হবে।

(ই) পোকামাকড় দমনঃ

আমের শোষাক পোকা/আমের হপার **(Mango hopper)** এই পোকার তিনটি প্রজাতি ক্ষতি করে থাকে। নিম্নে ক্ষতির প্রকৃতি দমন ব্যবস্থা দেয়া হল।

ক্ষতি প্রকৃতিঃ আমের অনিষ্টকারী পোকার মধ্যে এ পোকা সবচেয়ে বেশী ক্ষতি সাধন করে থাকে। আমের পাতা ও বোটায় এরা ডিম পাড়ে। এজন্য আক্রান্ত পাতা ও ফুল শুকিয়ে যায় এবং গুটি আসার পূর্বেই ফুল ঝরে যায়। এতে ফল মারাত্মকভাবে কমে যায়। এ পোকার আক্রমণের অন্যতম লক্ষণ হল, আক্রান্ত গাছের নিচে দিয়ে হাঁটলে পোকা লাফিয়ে গায়ে পড়ে।

দমন ব্যবস্থাঃ এ পোকা দমন করতে হলে মুকুল আসার আগে অথবা মুকুল আসার মুহূর্ত থেকে নিম্নলিখিত কীটনাশক স্প্রে করতে হবে: ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা লেবাসিড ৫০ ইসি চা চামুচের ৪ চামুচ ৮.৫ লিটার পানি। উপরোক্ত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।

ফলের মাছি বা আমের মাছি পোকা (Mango fruit fly)

ক্ষতির প্রকৃতিঃ এ পোকার কীড়া পাকা আমের মধ্যে প্রবেশ করে শাঁস খেয়ে ফেলে। এতে ফল পচে যায় ও ঝরে পড়ে। আক্রান্ত আম কাটলে অসংখ্য পোকা দেখা যায়। পোকার আক্রমণ বেশী হলে গাছের সমস্ত আম খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাঃ আম পাকার পূর্বে যখন পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ডিপটেরেক্স চা চামুচের ৪ চামচ ৮.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর দুই বার স্প্রে করতে হবে। অথবা ডায়জিনন ৫০ ইসি ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশে ফলে স্প্রে করতে হবে (উক্ত সময়ের ফল খাওয়া যাবে না)

আমের বিছা পোকা (Mango defollator)

ক্ষতির প্রকৃতিঃ এ পোকার কীড়া আম গাছের পাতা খেয়ে ফেলে। আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে পাতা শূন্য হয়ে যায় এবং ফুল-ফল হয় না বা হলেও ঝরে পড়ে। তবে কোন গাছ একবার আক্রান্ত হলে বার বার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দমন ব্যবস্থাঃ আক্রান্ত গাছে ডাইমেক্রম ১০০ ইসি ৩০০ মিলি বা ডায়াজিনন ৫০ ইসি ৪০০ মিলি বা সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ৪৫৪ মিলি ২২৫ লিটার পানিতে মিশে স্প্রে করতে হবে।

(কৃষি প্রযুক্তি পত্রিকা হতে সংগৃহীত)

কম্পিউটার অপারেটর আবশ্যক

জরুরী ভিত্তিতে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত দপ্তরের জন্য একজন অভিজ্ঞ কম্পিউটার অপারেটর প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীগণকে (আহমদী-নন-আহমদী নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। আলোচনা সাপেক্ষে বেতন নির্ধারণ করা হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা
মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী
ইশায়াত বিভাগ
৪নং বকশী বাজার, ঢাকা
মোবা : ০১৫৫৮৩৬০৪৮০

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ায় লাজনা ও নাসেরাতদের ৪র্থ স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১০/০১/২০১৮ ও ১১/০১/২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন কুরআন তিলাওয়াত করেন বুলবুলি আনিছ।

আহাদনামা পাঠ করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়া। কুরআন ক্লাস পরিচালনা করেন শাকিলা আনোয়ার। দোয়ার ক্লাস পরিচালনা করেন নিলুফা ইয়াছমিন। দোয়া করেন লাকী আহমদ, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়া। যাবতীয় কল্যাণ কুরআনে নিহিত এ সম্পর্কে বলেন মুক্তা বশির।

নামায শিক্ষা বিষয়ে ক্লাস নেন বিনতে ইয়াছমিন। সকল বিশ্বাসের মূল ভিত্তি আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ে বলেন, নুসরাত জাহান মুক্তা।

২য় দিন কুরআন তেলাওয়াত করেন স্বপ্না মোস্তারী, আহাদনামা পাঠ করেন লাকী আহমদ, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়া।

লাকী আহমদ,
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আমার পিতা:মোহাম্মদ মহীউদ্দিন গত ২০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ রোজ শনিবার রাত ১০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি বাল্যকালে খেলাধূলা ও মাছ শিকার করতে পছন্দ করতেন। তিনি সহজ সরল মানুষ হিসেবে নন-আহমদী ভাইদের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুকালে ৫ ছেলে ও নাতি নাতনি রেখে যান। তার মৃত্যুতে তেরগাতী জামাতের সকলেই মর্মাহত হন। মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন তার আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন এবং তার পরিবার পরিজন যেন বেদনা কাটিয়ে উঠতে পারে সেজন্য জামাতের ভাইবোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমের বড় ছেলে
জীবন মিয়া

মানবের প্রতি সহানুভূতি

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, 'গোটা মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হল আমার রীতি। কেউ যদি তার কোন হিন্দু প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লেগেছে দেখেও আগুন নেভানোর কাজে সহযোগিতা করতে উদ্যত না হয়, আমি সত্যি সত্যিই বলছি, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। আমার অনুসারীর মাঝে কেউ যদি দেখে একজন খ্রিস্টানকে কেউ হত্যা করতে উদ্যত- তখন সে যদি তাকে মুক্ত করতে সাহায্য না করে তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

(সিরাজে মুনীর, পৃষ্ঠা ২৮)

এ যুগের নিরাপদ দূর্গ

'এ যুগের দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায় তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই যে পাপ বর্জন করে এবং পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদা তা'লার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়। যে-ই এরূপ করবে সে আমার ও আমি তার।'

–প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

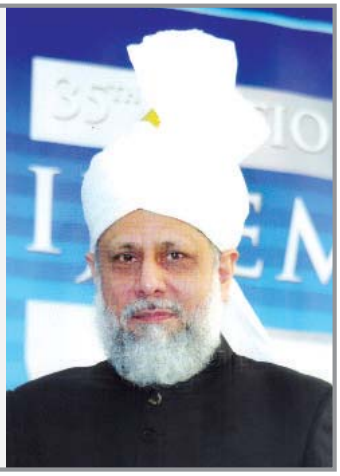

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٦﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿٢﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٣﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٤﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٥﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٥﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٦﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুল নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿٢﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٣﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٤﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ﴿٥﴾ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٦﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٧﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে
সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী
করেছেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কখনো না ! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা ! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া ! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা ! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা, সে জীবিত নয়, মৃত।”

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২১৫)

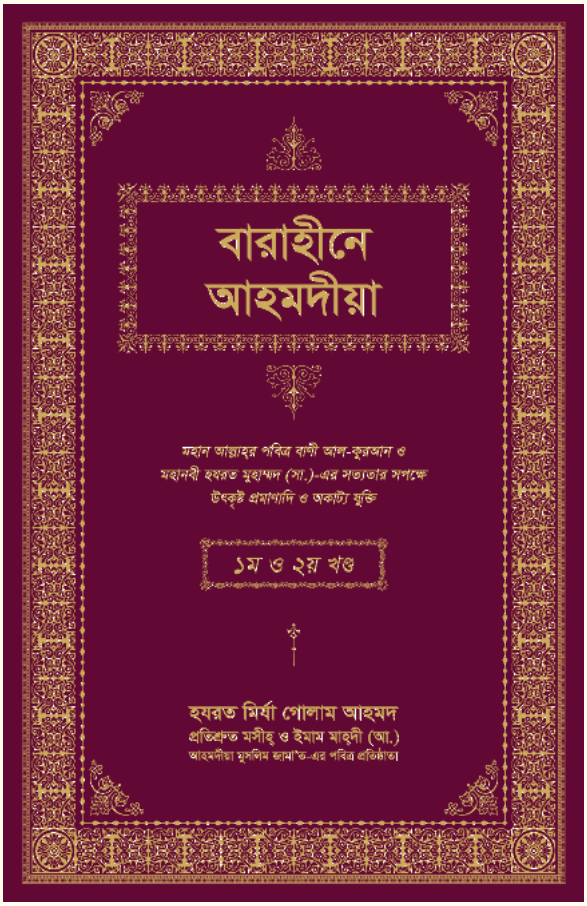

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

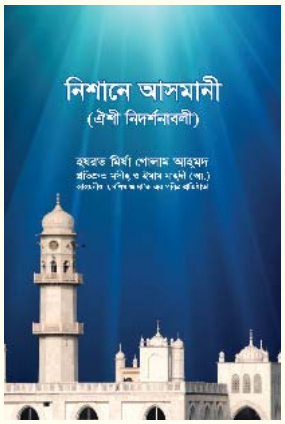

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

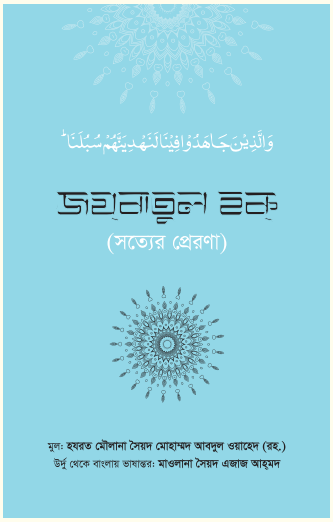

জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- টাকা মাত্র।

New Vol. No. 80 | 16th Issue
The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922
28th February, 2018 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

তোমরা যদি জান যে, আগামীকাল কেয়ামত হবে, তবে আজ হলেও একটি গাছ লাগিয়ে যাও– বৃক্ষ রোপণ সদকায়ে যারিয়া।

আল হাদীস

সুবংশে সুসন্তান শুধীজনে কয় সুবীজে সুফসল জানিবে নিশ্চয়

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
সাবেক ন্যাশনাল আমীর

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ
ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)